এখন ভেবে দেখো নুন ছাড়া বা কম নুন দেওয়া খাবার তোমাকে খেতে দেওয়া হলো। কেমন খেতে লাগবে তোমার?

— খেতে ভালো লাগবে/ভালো লাগবে না (সঠিক উত্তরটি বেছে নাও)।

তাহলে দেখো, খাদ্যের উৎস বা খাদ্যাভ্যাস যেমনই হোক না কেন, আমাদের খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো খাবার নুন। তার প্রধান একটা কারণ হলো নুনের স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া। অন্য কারণটা কী?

— আমাদের শরীরে নুনের প্রয়োজনীয়তা। এবিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। বাড়িতে সবাই খাবার নুন দেখেছ। নুনের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম কী কী?

(a) খাবার নুনের রং সাধারণত ....।

(b) সাধারণ অবস্থায় এটি .... পদার্থ।

(c) খাবার নুন জলে ....।

(d) একটুকরো কাগজের ওপর কিছুটা খাবার নুন ছড়িয়ে জানালার কাছে নিয়ে যাও। একটু স্পর্শ করলে বুঝতে পারবে নুন জিনিসটা দানা-দানা। আবার কাগজটা একটু কাত করে উলটেপালটে লক্ষ করলে দেখবে ওই দানাগুলোতে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এই ধরনের **নির্দিষ্ট আকারের দানাবিশিষ্ট পদার্থকে কেলাসাকার পদার্থ বলে**।

তাহলে কী বোঝা গেল?

খাবার নুন হলো একটি .... রঙের কেলাসাকার .... মিশ্র পদার্থ। এর প্রধান উপাদানের রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সংকেত NaCl।

প্রঃ— নীচের কোন কোন পদার্থ কেলাসাকার বলে তোমার মনে হয়?

চিনি, চকের গুঁড়ো, চুন, বালি, গায়ে মাখার পাউডার, ফটকিরি।

উঃ-- ....।

খাবারের মধ্যে বাইরে থেকে নুন (NaCl) যোগ করা হয়, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেটাই কী আমাদের শরীরে যতটা নুন প্রয়োজন তার একমাত্র উৎস?

(a) একটু দুধের সর বা একটু মাখন খেলে তার স্বাদ কেমন লাগে?

এদের স্বাদ ....। মাখনে নুন মেশানো হয়।

এই খাদ্যের উৎস উদ্ভিজ্জ না প্রাণীজ? এদের উৎস ....।

এ রকমই প্রাণীজ উৎস থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্যের মধ্য দিয়েই আমরা প্রয়োজনীয় নুনের বেশ কিছুটা পেয়ে যাই।

(b) পানীয় জলের মাধ্যমেও কিছুটা নুন দেহে প্রবেশ করতে পারে।

(c) উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে পরিমাণে কম হলেও কিছুটা নুন দেহ পেয়ে যায়।

কিন্তু দেহের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানোর জন্য যে বাইরে থেকে নুন খাবার প্রয়োজন, তা প্রাচীনকালেই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বুঝতে পেরেছিল। তখন তারা এই নুন সংগ্রহ করত কোথা থেকে?

তখন সামুদ্রিক লবণই ছিল খাবার নুনের প্রধান উৎস। আবার বিভিন্ন পাথরের খাঁজে জমে থাকা নুনও তারা সংগ্রহ করত।

এখন আমরা খাবার জন্য কতরকম লবণ ব্যবহার করি বলো তো?

মূলত: তিন ধরনের লবণ — (i) **সৈন্ধব বা সামুদ্রিক লবণ**
(ii) **বীট লবণ বা 'রক সল্ট'**
(iii) **খাবার নুন বা 'টেবিল সল্ট'।**

প্রথম দুটো লবণেরও মূল উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইড। তার সঙ্গে আরো অনেক যৌগও মিশে থাকে। সমুদ্র লবণে প্রায় 47 রকমের যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে 7 টি যৌগ উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হলো:

কী ধরনের যৌগ	কোন কোন ধাতুর যৌগ	যৌগের সংকেত লেখো
ক্লোরাইড যৌগ	সোডিয়াম	
	ম্যাগনেশিয়াম	
সালফেট যৌগ	ম্যাগনেশিয়াম	
	পটাশিয়াম	
	ক্যালশিয়াম	
ব্রোমাইড যৌগ	ম্যাগনেশিয়াম	
কার্বনেট যৌগ	ক্যালশিয়াম	

(a) ওপরের তালিকায় সবচেয়ে বেশি ধরনের যৌগ আছে কোন ধাতুটির? ....

(b) সমুদ্র লবণে বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ বিশ্লেষণ করেও দেখা গেছে এই ....ধাতুটির পরিমাণ সোডিয়ামের পরিমাণের ঠিক পরেই।

(c) অন্যান্য উপাদান হিসাবে যে সমস্ত যৌগ খুবই কম পরিমাণে থাকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড, ...(সংকেত লেখো)।

আমরা রোজকার জীবনে যে খাবার নুন ব্যবহার করছি তার উৎস তাহলে কী?

— সেই সমুদ্র লবণই; যদিও সমুদ্র লবণকে রাসায়নিকভাবে পরিষ্কার করার পর তার মধ্যে সোডিয়াম

ক্লোরাইডের পরিমাণ বেড়ে শতকরা 99.9 ভাগ হয়ে যায়। খাবার নুনের বাকি অংশটায় তাহলে কী মিশে থাকে?

তার জন্য একটা সহজ পরীক্ষা করো:

তোমাদের বাড়িতে বায়ুনিরুদ্ধ পাত্রে রাখা ও খোলা পাত্রে রাখা খাবার নুন ভালো করে লক্ষ করো। কিছুদিন এভাবে রাখা থাকলে দুটো আলাদা পাত্রে দু-ভাবে রাখা নুন কেমন অবস্থায় থাকে তা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে লেখো।

(a) আবদ্ধ পাত্রের নুন ....

(b) খোলা পাত্রের নুন ....

এই ঘটনাটা আরো ভালো করে বোঝা যায় বর্ষাকালে।

বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড বাতাস থেকে জল শোষণ করতে পারে না। নুনের মধ্যে থাকা প্রধান তিনটি উপাদান হলো --- সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালশিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড যৌগ। ওপরের ঘটনার জন্যে তাহলে নুনের মধ্যে থাকা কোন কোন যৌগ দায়ী?

....।

(a) আমাদের দেহের মধ্যে যে দেহতরল আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কী আছে? — তার প্রধান উপাদানই হলো............................।

(b) তাহলে দেহতরলের মধ্যে খাবার নুনের প্রধান উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইডের কী হয়?

— সোডিয়াম ক্লোরাইড আয়নে ভেঙে যায়:

সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$) $\longrightarrow$ সোডিয়াম আয়ন ($Na+$) + ক্লোরাইড আয়ন ($Cl-$)

(c) তাহলে খাবার নুনের অন্য মূল উপাদান দুটোর কী হয় দেহের মধ্যে?

— তারাও আয়নে ভেঙে যায়:

ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$) $\longrightarrow Mg^{2+} + 2Cl^-$

ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) $\longrightarrow$ .... + ...

(d) নুনের এই সোডিয়াম আয়ন (Na^+) দেহের জলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থেকে যায়। তাই দেহের মধ্যে তার কার্যকারিতাও বহুমুখী।

কোনো কারণে যদি তোমার ঠোঁট কেটে যায় বা খেতে গিয়ে গালের ভিতরে কামড় বসাও, তখন রক্তের স্বাদ কেমন লাগে?

— রক্তের স্বাদ ....।

(e) তাহলে রক্তের মধ্যেও .... দ্রবীভূত অবস্থায় আছে।

(f) পরিমাপ করলে দেখা যাবে মানুষের দেহে রক্তের 100 মিলিলিটারে NaCl-এর পরিমাণ 0.9 গ্রাম। মানব রক্তের প্রধান অংশটা কী?

— তা হলো .... ।

(g) রক্তের মধ্যেও NaCl আয়নিত হয়ে Na^+ ও Cl^- আয়ন তৈরি করে।

মানবদেহের সারা শরীরকেই যুক্ত করে রেখেছে এমন তরল মাধ্যমটি কী?

— তা হলো রক্ত।

নীচের ক্ষেত্রগুলোতে নুনের প্রভাবে কী ঘটবে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো :

কী করা হলো	কী ঘটতে দেখবে	কেন এরকম হবে
(1) আলুর চিপস বানানোর সময় আলু পাতলা করে কেটে নুন মাখিয়ে রাখা হলো।		
(2) কোনো গাছের গোড়ায় বেশি নুন দেওয়া হলো।		
(3) সদ্য কাটা মাছ বা মাংসের টুকরোয় নুন মাখিয়ে রাখা হলো।		

তোমাদের বাড়িতে বা পরিচিত কারোর উচ্চ রক্তচাপ থাকলে, ডাক্তারবাবু তাঁকে কী পরামর্শ দেন লক্ষ করো। দেখবে, তাঁকে কম নুন খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

তাহলে বেশি নুন খাওয়ার সঙ্গে আমাদের দেহের রক্তচাপের সম্পর্ক কেমন?

.... ।

তোমরা জেনেছ যে রক্তে একটা পরিমিত পরিমাণ নুন থাকেই। কিন্তু রক্তে নুনের পরিমাণ কোনো কারণে বেড়ে গেলে রক্ত কোশ কলা থেকে জল টেনে নেয়। ফলে রক্তের মধ্যে থাকা জলের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তখন রক্তের পরিমাণের কেমন পরিবর্তন হবে? .... ।

তখন রক্তের স্বাভাবিক চাপের কেমন পরিবর্তন ঘটতে পারে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো। .... ।

রক্তের চাপ যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়, আমাদের শরীরে কী ঘটতে পারে তা জেনে নেওয়া যাক।

শরীরের কোথায়	কী ঘটতে পারে
শিরা-ধমনি	বেশি রক্তচাপে ছিঁড়ে বা ফেটে যেতে পারে।
হৃৎপিণ্ডে	কপাটিকা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
মস্তিষ্কে	মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে।

এবছর খুব গরম পড়েছে। তাই ঘামও হচ্ছে খুব। স্কুলে যাবার সময় অয়ন রোজ ঠাকুমাকে একবার বলে, তবে বাড়ি থেকে বেরোয়। আজ বেরোনোর সময় অয়ন লক্ষ করল- ঠাকুমা যেন তাকে চিনতেই পারছেন না।

অয়ন জিজ্ঞেস করল— ও ঠাকুমা, কী হলো?

ঠাকুমা একটা উত্তর দিলেন বটে; অয়ন তার কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু সে এটা বুঝল যে ঠাকুমার শরীরে কোথাও একটা বড়োসড়ো গোলমাল হয়েছে।

তারপর অয়নের মা ফোন করে ডাক্তারবাবুকে খবর দিলেন। ডাক্তারবাবু এসে মন দিয়ে দেখলেন ঠাকুমাকে। তারপর অয়নের মাকে একটা গ্লাসে বেশ খানিকটা নুনজল তৈরি করে ঠাকুমাকে খাইয়ে দিতে বললেন। আর আশ্চর্য! একটু পরেই ঠাকুমা আবার আগের মতোই স্বাভাবিক।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অয়নের মা টিউবওয়েল পাম্প করছিলেন। অয়ন পড়তে বসে জানালা দিয়ে দেখছিল মায়ের জল ভরা। কিন্তু অয়ন দেখল- হঠাৎ মা পড়ে গেলেন। পরে ডাক্তার দেখাতে জানা গেল বাঁপায়ের নীচের দিকের হাড়টা ভেঙে গেছে।

এই দুটো ঘটনা থেকে অয়নের মতো তোমাদেরও নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে- কেন এমনটা হলো?

আমাদের শরীরের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম কী বলো তো?

— আমাদের স্নায়ু-ব্যবস্থা; যা পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে। স্নায়ুর কাজ কী?

— মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড ও দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংবেদন আদানপ্রদান করা। এই কাজে তার প্রধান সহায়ক কী?

— খাবার নুনে থাকা সোডিয়াম আয়ন (Na^+)। তবে পটাশিয়াম আয়ন (K^+) ও ক্যালশিয়াম আয়নও (Ca^{2+}) এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে আমাদের দেহে হঠাৎ কোনো কারণে নুনের পরিমাণ কমে গেলে আমাদের শরীরের কোন ব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়বে?

....।

— এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে খিঁচুনি দেখা দেবে। কথাবার্তাও অসংলগ্ন হয়ে যেতে পারে।

খাবার নুনে থাকা NaCl ছাড়া আরো দুটো লবণের কথা আমরা আগেই জেনেছি। সেই দুটো লবণ দেহের মধ্যে সোডিয়াম ছাড়া কী কী ধাতব আয়ন উৎপন্ন করে?

.... ও .... আয়ন।

এদের মধ্যে ক্যালশিয়াম আমাদের শরীরে কী কাজ করে?

— মূলত দুটো কাজে ক্যালশিয়াম সাহায্য করে: (i) হাড় ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে, (ii) হৃৎপেশির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

হাড়ের গঠনে ক্যালসিয়াম কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা পরের পৃষ্ঠার কর্মপত্র পূরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করো।

কর্মপত্র

(a) আমাদের শরীরে হাড়ের ওজনই সবচেয়ে বেশি। এই হাড় বা অস্থির মূল উপাদান কোন ধাতু?

.... ।

(b) শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম আমরা কোন কোন উৎস থেকে পাই?

(i) প্রাণীজ উৎস থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্য; যেমন — দুধ, দই, ছোটো মাছের কাঁটা ইত্যাদি।

(ii) অন্য একটা উৎস হলো খাবার নুন।

জানো তো, আমাদের শরীরের মধ্যে যতটা ক্যালশিয়াম আছে তার শতকরা 99 ভাগই আছে হাড়ের মধ্যে। হাড়ে এই ক্যালশিয়ামকে জমা করার জন্য ভিটামিন D প্রয়োজন।

(c) আমাদের শরীরের হাড়ের ভেতরটা কেমন হতে পারে?[(i) ও (ii)-এর প্রশ্ন থেকে সঠিক উত্তর বেছে নাও]

(i) (a) ফাঁপা (b) নিরেট, (ii) (a) শুকনো (b) জলীয় তরল ও রক্তে পরিপূর্ণ ।

(d) আবার ভাবো, রক্তে Ca^{2+} আয়নের ঘাটতি হয়েছে। তাহলে শরীরের যেখানে ক্যালশিয়ামের ভাণ্ডার রয়েছে, সেখান থেকেই শরীর তা নিয়ে ওই ঘাটতি পুষিয়ে নেবে।

আমাদের শরীরের বেশিরভাগ ক্যালশিয়াম কোথায় আছে? .... ।

তাহলে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি পূরণ করার জন্য শরীর কোথা থেকে তা নেবে? ....।

(e) এই অবস্থায় শরীরের মধ্যে হাড়ের কী হবে?

— হাড় দুর্বল হয়ে যাবে। কখনও ভেঙেও যেতে পারে।

শরীরে যদি ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হয়, তাহলে কী দাঁতের গঠনেও কোনো প্রভাব পড়বে না? নিজেরাই ভেবে দেখো।

খাবার নুনের মধ্যে উপস্থিত অন্য গুরুত্বপূর্ণ ধাতব আয়ন অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়ামের কী কী ভূমিকা থাকতে পারে আমাদের শরীরে? নীচের কর্মপত্রটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে পূরণ করো।

(a) আমাদের রক্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শ্বেতকণিকা। এই শ্বেতকণিকার কাজ কী?

.... ।

(b) শরীরে ভিটামিন D কী কাজ করে? .... ।

(c) শরীরে উপস্থিত বিভিন্ন উৎসেচক কী কাজ করে? .... ।

(d) শরীরের মধ্যে গ্লুকোজ কীভাবে শক্তি উৎপন্ন করে? .... ।

এই প্রক্রিয়াগুলোর অনেকগুলোতেই ম্যাগনেশিয়াম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ও তার কার্যকারিতা বাড়ায়।

জেনে রাখো: দূষণমুক্ত সমুদ্র উৎস থেকে বিশেষভাবে একধরনের নুন তৈরি করা হয় যাকে Organic Sea Salt বলে। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ম্যাগনেশিয়াম উপস্থিত থাকে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ—অন্যান্য প্রাণীর থেকে মানুষ যে এত বুদ্ধিমান, তার একটা কারণ মানুষের মস্তিষ্কের গঠন। অন্য কারণটা হলো খাদ্যের মাধ্যমে নুন গ্রহণ করা। এই নুনের চাহিদা মেটানোর জন্যই অভয়ারণ্যের 'সল্ট লিক' -এ পশুদের নুন খেতে দেওয়া হয়। যে কোনো প্রাণীর শরীরে জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে তাদের দেহে নুনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে আমরা খাবার জন্য যে প্যাকেটের নুন ব্যবহার করি তার প্যাকেটের গায়ে লক্ষ করলে তোমরা দেখতে পাবে ওই নুনের মধ্যে একটা বিশেষ মৌল যুক্ত আছে। সেই মৌলটা হলো আয়োডিন।

আয়োডিনের জোগান দিতে নুনে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পটাশিয়াম আয়োডেট (KIO_3) মেশানো হয়।

আমাদের শরীরে আয়োডিনযুক্ত নুন প্রয়োজন কেন?

সুমনের কাকিমা কিছুদিন আগেও ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। এখন তার থেকে অনেক দেরি করে উঠছেন। বাড়ির বিভিন্ন কাজ করার সময়ও কাকিমার ক্লান্তি ফুটে উঠছে।

একদিন তো কাপে করে কাকুকে চা দিতে গিয়ে কীভাবে যেন কাপটা পড়েই গেল কাকিমার হাত থেকে। যখন তখন সর্দিতে ভুগছেন কাকিমা; মাঝে মাঝেই মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন; খিটখিটেও হয়ে গেছেন একটু।

কাকিমা নিজেও বলছেন— শরীরটা যেন আর চলছেই না। কিছুই খাচ্ছি না, তাও যেন মোটা হয়ে যাচ্ছি।

সুমন দেখল যে কাকিমার গলার আওয়াজটাও একটু ধরা-ধরা। গলার কাছটা যেন একটু মোটাও মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুকে দেখাতে তিনি বলেছেন— সুমনের কাকিমার থাইরয়েডের সমস্যা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো 'থাইরয়েড' কী?

তোমার হাতের দুটো আঙুলের স্পর্শে গলায় স্বরযন্ত্রের উপস্থিতি বুঝতে পারবে। এই স্বরযন্ত্রের ওপর দু-পাশে ছোটো একটা গ্রন্থি আছে, যাকে থাইরয়েড গ্রন্থি বলে।

এই গ্রন্থির কার্যকারিতা আয়োডিনের ওপর নির্ভরশীল। **শরীরে আয়োডিন কম হলে এই থাইরয়েড গ্রন্থির কী পরিবর্তন হয়?**

তখন **বেশি কাজ করে কার্যকারিতা বজায় রাখতে গিয়ে থাইরয়েড গ্রন্থি বড়ো হয়ে যায়। তখন গলা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়; একেই 'গয়টার' বা গলগণ্ড বলা হয়।**

থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা কমে গিয়ে মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব পর্যন্ত হতে পারে।

আর কী কী ভাবে আয়োডিন আমাদের শরীরে কাজ করে?

মস্তিষ্কের বিকাশে আয়োডিন সাহায্য করে, তাই শিশুদের পক্ষে এটি অপরিহার্য।

তাছাড়াও শারীরিক-মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে আয়োডিনের অভাবে।

জেনে রাখো: আয়োডিন ব্যবহারের একটা ইতিহাস আছে আমাদের দেশে। অনেক আগে আয়োডিন ছাড়া নুনই ব্যবহার হতো খাবার জন্য। বিংশ শতকে পঞ্চাশের দশকে প্রফেসার ভি. রামলিঙ্গস্বামীর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায় 'গয়টার' রোগের কারণ হিসাবে দেহে আয়োডিনের ঘাটতিকে চিহ্নিত করেন। এর ফলে 1962 সাল থেকেই ভারত সরকার 'গয়টার' প্রাদুর্ভূত এলাকায় আয়োডিনযুক্ত নুন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। WHO ও UNICEF-এর সহায়তায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োডিনযুক্ত নুন তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। 1983 সালে ভারতের জনসংখ্যা অনুপাতে এর উৎপাদন যথেষ্ট হয়।

সাধারণত সমতলের চেয়ে পাহাড়ি এলাকায় আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যার প্রকোপ বেশি।

আমরা যেমন বিভিন্ন উৎস থেকে দেহের মধ্যে লবণ গ্রহণ করছি, তেমনই শরীর থেকে অতিরিক্ত লবণের রেচনও ঘটছে।

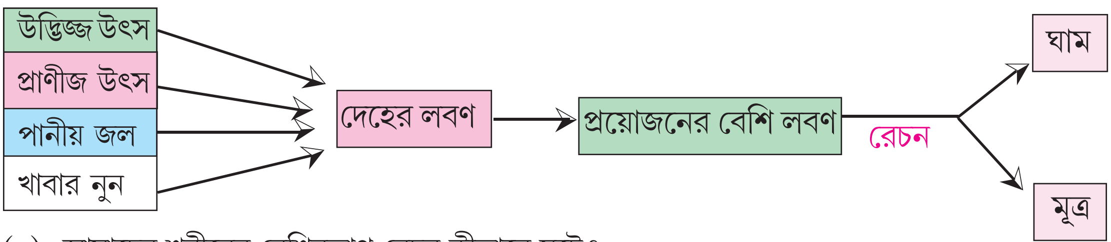

(a) আমাদের শরীরের বেশিরভাগ রেচন কীভাবে ঘটে?

.... এর মাধ্যমে ঘটে, যার বেশিরভাগই জল।

(b) জল যেহেতু নুনকে দ্রবীভূত করে রাখে, তাই আমাদের প্রধান রেচন পদার্থ............................... এর মধ্যে অনেকটা .... ও উপস্থিত থাকে।

(c) রেচনক্রিয়ায় দেহের ভেতরের মূলত কোন রেচন অঙ্গ কাজ করে? — বৃক্ক (কিডনি)।

(d) যদি কোনো কারণে রক্তে নুনের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে কী হবে?

দেহের প্রয়োজনের থেকে আরো বেশি এই লবণের রেচনের প্রয়োজন, তাহলে আমাদের প্রধান রেচন পদার্থের পরিমাণের কেমন পরিবর্তন ঘটবে? — মূত্রের পরিমাণ বাড়বে/কমবে (ঠিক উত্তরটি বেছে নাও)।

তখন আমাদের প্রধান রেচন অঙ্গকে বেশি কাজ করতে হবে।

(e) এখন ভাবো, কারো বৃক্কের কার্যকারিতা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। তখন তাঁকে কী পরামর্শ দেওয়া হবে? .... ।

দীর্ঘদিন লিভারের রোগে ভুগলেও একই পরামর্শ দেওয়া হয়।

খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজে নুন ব্যবহার হতে দেখো তোমরা?

তোমাদের বাড়িতে মা-ঠাকুমাকে আমের বা অন্য জিনিসের আচার বানাতে দেখেছ। তাঁদের কাছে একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবে যে তার একটা প্রধান উপাদান হলো নুন।

বেশিরভাগ সময়েই আমের টুকরো (বা, অন্য জিনিসেও) নুন মাখিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। এটা করা হয় দুটো কারণে—

i) যাতে আমের টুকরোর বেশিরভাগ জলীয় অংশ বেরিয়ে যায়।

ii) বাতাসে ভেসে থাকা জীবাণুর থেকে ওই জিনিসটা বেশিদিন ভালো থাকে।

কীভাবে কাজ করে নুন? নুনের সংস্পর্শে আসা জীবাণুর কোশতরল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে আসে। তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবাণু মরে যায়। তাই খাদ্য সংরক্ষণ করার জন্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই পদ্ধতি চালু রয়েছে।

সংরক্ষক হিসাবে নুন ব্যবহার করা হচ্ছে, এরকম আরো উদাহরণ দাও:

(a)

(b)

(c)

সমুদ্র, পর্বত বা মেরু অভিযানের ক্ষেত্রে অভিযাত্রীরা যে সংরক্ষিত বা টিনবন্দি খাবার নিয়ে যান তা থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় নুন তাঁরা পেয়ে যান।

জেনে রাখো: এখনকার প্রচলিত শব্দ Salary (মাহিনা) এসেছে Salt থেকে; প্রাচীন রোমের সেনাবাহিনীর অফিসারদের নুন কেনার জন্যে যে অর্থ দেওয়া হতো তখন তাকে বলা হতো 'Salarium'। এর থেকেই Salary শব্দের উৎপত্তি।

তাহলে ভাবো, একসময়ে খাদ্যলবণ এত সহজলভ্য বস্তু ছিল না নিশ্চয়ই। মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এর অভাব অনুভব করেছে; আর তাকে সহজলভ্য করেছে। নুন নিয়ে আমাদের দেশসহ বহু দেশেই অনেক প্রবাদ প্রচলিত। সেগুলো জানার চেষ্টা করো।

নীচের ক্ষেত্রগুলোতে কীভাবে লবণের ব্যবহার করা যেতে পারে তা লেখো।

কোন ক্ষেত্রে	কীভাবে খাদ্যলবণ কাজে লাগবে
1. তোমার দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে	
2. হঠাৎ একদিন তোমার ঘনঘন বমি ও ডায়ারিয়া হলো	তোমাকে কিছু সময় অন্তর অল্প করে নুন ও সামান্য চিনি মেশানো জল খেতে হবে
3. তোমার গলায় ব্যথা হলো	
4. তোমার পায়ে জোঁক কামড়ে ধরল	
5. তোমাকে পাকা তেঁতুল সংরক্ষণ করতে বলা হলো	
6. কারোর রক্তচাপ কমার লক্ষণ দেখা দিলে	

সংশ্লেষিত যৌগ ও পরিবেশে তার প্রভাব

তোমরা প্রত্যেক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাদের একটা তালিকা বানাও। তাদের উৎস প্রাকৃতিক, প্রক্রিয়াজাত না মানুষের সৃষ্টি তা উল্লেখ করো :

রোজকার ব্যবহার্য জিনিসের নাম	কীভাবে তৈরি		
	প্রাকৃতিক	প্রক্রিয়াজাত	মানুষের সৃষ্টি
মাজন বা টুথপেস্ট			
পাউডার			
সাবান			
শ্যাম্পু			
ডিটারজেন্ট			
রিঠা ফল			
মশারির সুতো			
নারকেল তেল			

তোমাদের তৈরি ওপরের তালিকা থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমরা প্রতিদিন যেসমস্ত জিনিস ব্যবহার করি তার কিছু প্রাকৃতিক হলেও বেশিরভাগ জিনিসই কৃত্রিমভাবে **সংশ্লেষিত** পদার্থ থেকে তৈরি। এগুলো যেমন আমাদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে, তেমনি এদের অনেক কুপ্রভাবও আছে যা আমরা পরে জানব।

তোমরা সকলেই খেলতে ভালোবাসো। ধরো তুমি ফুটবল খেলো। ফুটবল খেলতে যে জিনিসগুলো লাগে তার একটা তালিকা বানাও; আর এসো দেখি তার কোনটা কী জিনিস দিয়ে তৈরি।

কোন জিনিস	কী দিয়ে তৈরি	ব্যবহার বন্ধ হওয়ার পর জিনিসগুলোর কী হয়

তোমাদের স্কুলে বা পাড়ায় মাঝে মাঝে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে যে জিনিসগুলো লাগে তাদের ছবি নীচে দেওয়া হলো। ছবি দেখে তাদের নাম লেখো এবং আলোচনা করে লেখো সেগুলো কীসের তৈরি আর তাদের উৎস প্রাকৃতিক না সংশ্লেষিত?

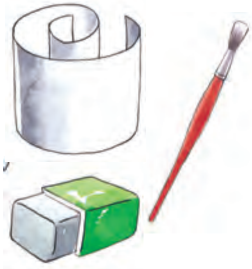

কী জিনিস	কীসের তৈরি বলে মনে হয়	উৎস		
		প্রাকৃতিক	প্রক্রিয়াজাত	সংশ্লেষিত
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

ওপরের ছক তিনটে দেখে একটা বিষয় স্পষ্ট যে আমাদের চারপাশের যে সমস্ত জিনিসের নাম আমরা বলছি বা দেখছি বা ব্যবহার করছি তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক জিনিসেরই উৎস প্রাকৃতিক; তাদের অধিকাংশই সংশ্লেষিত পদার্থ থেকে তৈরি। নীচের ছবিটা লক্ষ করে দেখো, আমরা কীভাবে প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ধরনের পদার্থ ব্যবহার করছি।

সংশ্লেষিত পদার্থ থেকে তৈরি জিনিস

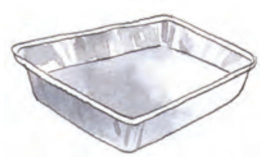

1. ওপরের ছবিতে যেসব বস্তুর ছবি দেওয়া আছে তা তৈরিতে যে যে সংশ্লেষিত পদার্থের ব্যবহার হয়েছে সেগুলি কী কী?

...................., ..., ..., ..., ...।

2. ওই ধরনের সংশ্লেষিত পদার্থ আর কী কী জিনিস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়?

সংশ্লেষিত পদার্থটির নাম	তার ব্যবহার
প্লাস্টিক	

3. যে সমস্ত সংশ্লেষিত পদার্থগুলোর নাম তোমরা জানলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাদের আর কোনো ব্যবহার জানা থাকলে লেখো।

..........., ..., ..., ...।

একটা প্রশ্ন তোমাদের মনে আসতেই পারে যে কেন আমরা এতসব ধরনের সংশ্লেষিত পদার্থের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম। প্রাকৃতিক জিনিসের থেকে এই সমস্ত মানুষের সৃষ্টি করা জিনিসগুলোর কার্যকারিতা বেশি। তাই এদের ব্যবহারও বেশি। ওপরের তালিকায় যতরকম সংশ্লেষিত পদার্থের ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের মধ্যে প্লাস্টিক, পলিথিন, কৃত্রিমভাবে তৈরি সুতো - এরকম অনেকগুলোকেই পলিমার বলা হয়।

এখন দেখা যাক, পলিমারজাতীয় পদার্থগুলো কেমনভাবে তৈরি হয়।

পলিমার

তোমরা সকলেই ফুলের তৈরি মালা দেখেছ। এটা কীভাবে তৈরি করা হয়? অনেকগুলো একই ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের ফুল একসঙ্গে একটা সুতো দিয়ে গাঁথা। একটা লোকাল ট্রেনে অনেকগুলো একরকম কামরা জোড়া থাকে। ঠিক এইভাবেই **অনেক ছোটো ছোটো যৌগ অণু জুড়ে তৈরি হয় বৃহৎশৃঙ্খল যৌগ বা পলিমার**। **পলিথিন** পলিমারটি অনেক ইথিলিন (C_2H_4) অণু জুড়ে তৈরি হয়।

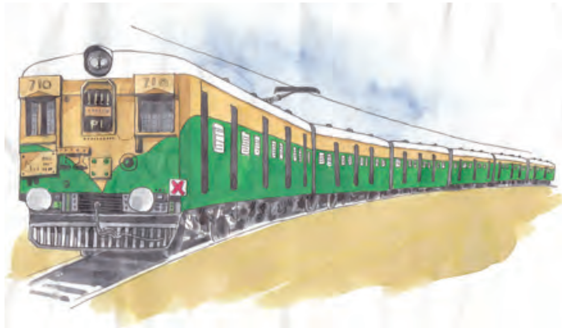

$(C_2H_4)_n$

$(C_2H_4)_n$ হলো পলিইথিলিন বা পলিথিন। এখানে n দিয়ে বহু সংখ্যক ইথিলিন অণু বোঝানো হয়েছে।

জানো কি?—‘পলিমার’ শব্দটার উৎপত্তি দুটো গ্রিক শব্দ পলি (poly) ও মেরোস (meros) থেকে। ‘পলি’ মানে বহু, আর ‘মেরোস’ কথার অর্থ অংশ বা খণ্ড (parts)।

এছাড়াও আমরা যে চিউইং গাম খাই এবং আঠা বা অ্যাডহেসিভ জাতীয় যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করি সেগুলোও বিভিন্ন নরম পলিমার দিয়ে তৈরি। আবার কৃত্রিমভাবে তৈরি সুতোগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই পলিমার জাতীয় পদার্থ।

সংশ্লেষিত তন্তু

অনেকদিন থেকেই জামাকাপড় তৈরিতে সুতির সুতো ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সেগুলো কম টেকসই আর তার সৌন্দর্য বজায় রাখা ছিল কঠিন। যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসাবে এল পলিএস্টার, রেয়ন, অ্যাক্রাইলিক ইত্যাদি। তারপর সুতির সুতোর সঙ্গে এগুলো মিশিয়ে নতুন ধরনের সুতো তৈরি হতে লাগল।

করে দেখো : কোনটা শক্ত, একটা সুতির সুতো, না একটা টেরিকটের সুতো? দুটো একই মাপের স্বচ্ছ প্লাস্টিকের খালি ও মুখ খোলা বোতল নাও। এবার দু-রকম সুতোর সাহায্যে দুটো বোতল ঝোলাবার ব্যবস্থা করো। এরপর দুটো বোতলেই ধীরে ধীরে জল ঢালতে থাকো। কী করলে ও কী দেখলে লেখো।

কী করা হলো	কী বোঝা গেল

প্রাকৃতিক পলিমার : নানান ধরনের **শর্করা (কার্বোহাইড্রেট) জাতীয় পলিমার দিয়ে উদ্ভিদদেহে সুতো বা আঁশ তৈরি হয়। আবার প্রাণীদেহের মাংসপেশি, লিগামেন্ট বা টেনডন তৈরি হয় প্রোটিনজাতীয় পলিমার দিয়ে।**

করে দেখো :- মোমবাতির আগুনের কাছে সাবধানে কিছুটা সুতির সুতো ও কিছুটা নাইলন সুতো একটি চিমটে দিয়ে ধরে দেখো।

কী দেখলে	কী বোঝা গেল

তাহলে রান্না করা বা বাজি পোড়ানোর সময় আমরা কেমন জামাকাপড় পরব?

— সিন্থেটিক সুতোর তৈরি জামাকাপড় আগুনের গরমে গলে গিয়ে চামড়ায় আটকে যেতে পারে। তাই ওই সময় সুতির জামাকাপড় পরাই উচিত।

আমরা রোজই অনেকরকমের প্লাস্টিকের জিনিস ব্যবহার করি। কিন্তু সব প্লাস্টিকই কি একই ধরনের?

লক্ষ করলে দেখবে বিভিন্ন জিনিসে ব্যবহৃত প্লাস্টিক প্রধানত দু-ধরনের।

(i) একধরনের প্লাস্টিক নরম; তাদের আকৃতি তাপ দিয়ে (বা অন্যভাবে) পালটানো যায়। তাদের গলানো যায়, বাঁকানো যায়। তাই এধরনের প্লাস্টিককে থার্মোপ্লাস্টিক বলা হয়।

(ii) অন্য আর একধরনের প্লাস্টিক একবার শক্ত হয়ে গেলে তাপ দিয়েও তাদের আকৃতি আর পালটানো যায় না। তাই এধরনের প্লাস্টিককে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলা হয়।

নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসে পলিমারের ব্যবহার

পলিমারের নাম	প্রকৃতি বা গুণাবলি	ব্যবহার
পলিথিন	অত্যন্ত নমনীয় ও জলরোধক	
PVC	মজবুত, তাপ ও তড়িতের অন্তরক, জলরোধক, থার্মোপ্লাস্টিক	
PET	দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত, থার্মোসেটিং প্লাস্টিক	জলের বা পানীয় দ্রব্যের বোতল,খাবারের বাক্স তৈরিতে।

সাবান ও ডিটারজেন্ট

তোমাদের বাড়িতে গায়ে মাখার জন্য, জামাকাপড় পরিষ্কার করতে বা নীচে লেখা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয় এমন কোনো সংশ্লেষিত পদার্থের কথা জানা থাকলে লেখো।

কোন কাজে	কী ব্যবহার করো
গা, হাত, পা ধোয়ার কাজে	
চুল পরিষ্কার করার জন্য	
বাসনপত্র মাজার জন্য	

এখানে যে পদার্থগুলোর নাম দেখা গেল তাদের বেশিরভাগই সাবান বা ডিটারজেন্ট শ্রেণির। তোমরা জানো কি যে ডিটারজেন্ট দিয়ে জামাকাপড় পরিষ্কার করা হয়, দাঁত মাজার পেস্ট বা চুল পরিষ্কার করার শ্যাম্পুতেও একইরকম কিছু পদার্থ থাকে।

সাবান হলো কিছু জৈব অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম যৌগ, যা তৈরি হয় চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কস্টিক ক্ষারের ($NaOH$ বা KOH) বিক্রিয়ায়।

চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেল + কস্টিক ক্ষার → সাবান + গ্লিসারিন।

পেট্রোলিয়াম বা অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বন জাতীয় যৌগের সঙ্গে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যাসিডের জলে দ্রাব্য যৌগ হলো ডিটারজেন্ট। বাজারের ডিটারজেন্ট বিভিন্ন যৌগের মিশ্রণ।

যেসব উৎস থেকে পাওয়া জল আমরা সাধারণত জামাকাপড় কাচার জন্য ব্যবহার করি সেগুলো নীচে দেওয়া হলো। বাড়ির বড়োদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করো এগুলোর মধ্যে কোন কোন উৎসের জল ব্যবহার করে কোন ক্ষেত্রে কীরকম ফেনা তৈরি হয়; তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো।

জলের উৎস	সাবান ব্যবহারে কেমন ফেনা হয়	ডিটারজেন্ট ব্যবহারে কেমন ফেনা হয়
পুকুরের/দিঘির জল		
কুয়োর জল		
নলকূপের জল		
নদীর জল		
শহরের কলের জল		

এখন বুঝতে পারছ সাবান না ডিটারজেন্ট কোনটায় জামাকাপড় বেশি ভালো পরিষ্কার হয়?

সাবান সবরকম উৎসের জলে সমানভাবে কার্যকরী হয় না, কিন্তু ডিটারজেন্ট যে-কোনো জলেই সমান কার্যকর। তাইতো আমাদের চারদিকে ডিটারজেন্টের এত ব্যাপক ব্যবহার।

সার ও কীটনাশক

দলগত কাজ: তোমাদের স্কুলের বা বাড়ির আশেপাশের চাষের ক্ষেতে অথবা কোনো নার্সারিতে গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে দেখো ও জানো সার ও কীটনাশক কোন কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

যে জিনিসগুলোর ব্যবহার তোমরা জানলে, আরও বিস্তারিতভাবে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

কী চাষ করতে	কী ব্যবহার হচ্ছে	কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে	পদার্থটার উৎস প্রাকৃতিক না কৃত্রিমভাবে তৈরি
ধান			
শাকসবজি			
ফুল			

ওপরের সারণি থেকে তোমরা মূলত দু-ধরনের জিনিসের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছ; যার বেশিরভাগই প্রাকৃতিক নয়, সংশ্লেষিত।

গাছের বৃদ্ধি ও ফলন বাড়ানোর জন্য যা ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো কী? ....।

গাছকে রোগ বা পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যা ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো কী? ....।

তোমাদের পরিচিত কয়েকটি সার ও কীটনাশকের মধ্যে থাকা সংশ্লেষিত পদার্থের নাম দেওয়া হলো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে আরও কয়েকটি নাম যোগ করো।

সারের নাম	কীটনাশকের নাম
ইউরিয়া	মিথাইল প্যারাথিয়ন
	অলড্রিন
	কার্বারিল

টুকরো কথা : তোমরা র‍্যাচেল কারসনের লেখা Silent Spring বইটার কথা হয়তো শুনে থাকবে। এই বইতে তিনি প্রথম ডি.ডি.টি কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সারা পৃথিবীকে সচেতন করেন। দেখা গেছে, পাখি বা কচ্ছপের দেহে এই কীটনাশকের প্রভাবে ডিমের খোলা পাতলা হয়ে যায়। বাচ্চা বেরোবার জন্য পেটের নীচে ডিম রেখে তা দিতে গেলেই ডিম ফেটে নষ্ট হয়ে যায়। পোকামাকড় মারতে এরকম কীটনাশকের ব্যবহারের জন্য আজ মৌমাছি, রেশমপোকা, নানা পাখির বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। আগামী দিনের বসন্তকাল তাই পাখির কাকলিহীন হয়ে যাবে—এমনই বলতে চেয়েছেন শ্রীমতি কারসন। আর খাদ্যের মধ্যে দিয়ে কীটনাশক মানুষের দেহে ঢুকে নানা অজানা রোগের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তুলছে। পৃথিবীর বহু দেশেই ডি.ডি.টি নিষিদ্ধ কীটনাশক।

প্রসাধনী, সুগন্ধি দ্রব্য

তোমাদের পরিচিত কিছু জিনিসের ছবি নীচে দেওয়া আছে। দেখো তো চিনতে পারো কিনা। তাদের ব্যবহার লেখো।

a b c d e f g h

কী জিনিস	কী কাজে লাগে
a.	
b. শ্যাম্পু	
c.	
d. টুথপেস্ট	
e. বডি স্প্রে	
f. পাউডার	
g.	
h.	

তোমরা এতরকম প্রসাধনীর ব্যবহার দেখছ। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জানার চেষ্টা করো তোমাদের পরিচিত কারোর ত্বকে বা দেহের অন্য অংশে এই সমস্ত জিনিসের কোনো কুপ্রভাব পড়েছে কিনা :

কোন ধরনের প্রসাধনীতে	কীরকম কুপ্রভাব পড়তে পারে
চুল রং করার কলপ বা ডাই	চুলকানি ও লাল হয়ে ফুলে ওঠা
সুগন্ধি স্প্রে	শ্বাসের সমস্যা

এরকম কেন হয় বলো তো?

প্রসাধনীতে এমন অনেকরকম সংশ্লেষিত পদার্থ মেশানো হয় যেগুলোর প্রভাবেই এই সমস্যা ঘটে। তাই এরকম সমস্যা যাঁদের হয় তাঁদের এই সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলাই উচিত।

ওষুধ

নীচের তালিকা থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে ছকটির প্রথম দুটো স্তম্ভ পূরণ করো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও বড়োদের বা শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে তৃতীয় স্তম্ভটি পূরণ করো।

কোন ধরনের অসুখে	সাধারণত ডাক্তারবাবু কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করতে বলেন	এর পরিবর্তে আগেকার সময়ে কী ধরনের ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করা হতো
জ্বর	জ্বরনাশক	
ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণে পেটখারাপ হলে	অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণুনাশক	
অম্বল বা অ্যাসিডিটি	অ্যান্টাসিড	
ছড়ে যাওয়া বা কেটে যাওয়া	অ্যান্টিসেপটিক	গাঁদা গাছের পাতার রস বা দূর্বার রস
চোট লেগে ব্যথা হলে	পেনকিলার বা বেদনানাশক	

ওষুধ হিসাবে আমরা যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করছি তার প্রায় সবই সংশ্লেষিত যৌগ। অথচ একটা সময় ছিল, যখন মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর শারীরিক অসুস্থতা নিরাময়ে ব্যবহৃত হতো প্রাকৃতিক বা ভেষজ ওষুধ। আমাদের চারপাশেই সেই সমস্ত উপাদান ছড়িয়ে আছে। শুধু প্রয়োজন তা প্রয়োগ করার উপযুক্ত জ্ঞানের।

তোমার বাড়ির পোষা কুকুর-বিড়ালকে কখনও ঘাস খেতে দেখেছ?

এভাবে একটু লক্ষ করলে দেখতে পাবে আমাদের চারপাশের মনুষ্যেতর জীব কীভাবে প্রাকৃতিক বা ভেষজ উপায়ে নিজেদের সুস্থ রাখে। কেবল আমরা, মানুষরা শুধুমাত্র প্রকৃতির ওপর এব্যাপারে নির্ভরশীল থাকতে পারিনি। তার প্রধান কারণ কী কী হতে পারে?

একটা কারণ যদি হয় আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, তবে অন্য কারণগুলো হলো মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও পুরোনো ওষুধের বিরুদ্ধে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর প্রতিরোধ গড়ে ওঠা। তাই আরও নতুন নতুন ওষুধ তৈরি করার প্রয়োজন হচ্ছে। বিজ্ঞানের নানা গবেষণার ফলাফলকে শুধু মানুষই ব্যবহার করতে পারে।

একটা বিষয়ে লক্ষ করেছ কি, যে সমস্ত মোড়কের মধ্যে ওষুধ থাকে সেগুলো আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিই, তারপর সেগুলোর কী হয়? নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

রং ও রঞ্জক

আমাদের পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের দর্শনেন্দ্রিয় শুধুমাত্র সাদা-কালো ছবি বা বস্তু দেখার জন্যই তৈরি। কিন্তু আমরা, মানুষরা রঙিন জিনিস দেখতে অভ্যস্ত। তোমাদের চারপাশে যে সমস্ত রঙিন জৈব-অজৈব জিনিস দেখতে পাচ্ছ তার একটা তালিকা তৈরি করো। আর শিক্ষক/শিক্ষিকার সহায়তায় তাদের রঙের উৎস সন্ধান করো :

কী জিনিস	তার রঙের উৎস
গাজর	জৈব
হলুদ	
গাঁদা বা গোলাপ ফুলের পাপড়ি	
রঙিন প্লাস্টিকের বালতি	

তোমাকে বাড়ির দেয়াল, দরজা-জানালা অথবা লোহার আলমারি রং করতে বলা হলো। কোন ক্ষেত্রে তুমি জলে গোলা রং বা তেলে গোলা রং ব্যবহার করবে?

কোন ক্ষেত্রে	কেমন রং ব্যবহার করবে
দেয়াল	জলে গোলা রং
দরজা-জানালা	তেলে গোলা রং
লোহার আলমারি	তেলে গোলা রং

এরকম রং ব্যবহার করার আগে কী কী করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো?

....।

প্রায় কোনো রং-ই কৌটো খুলেই সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। কারণ, এখনকার ব্যবহৃত বেশিরভাগ রং-এর দুটো অংশ আলাদা হয়ে থাকে। তাদের মেশানোর দরকার হয়। রং-এর মধ্যে এই দুটো অংশ কী কী?

— (i) দ্রাবক অংশ (যা সাধারণত বর্ণহীন বা হালকা রঙিন),

(ii) রঞ্জক বা পিগমেন্ট অংশ (রঙিন যৌগের কণা)।

বেশিরভাগ রং-এরই এই দুটো অংশই কৃত্রিমভাবে তৈরি।

জানো কি? অনেক আগে জামাকাপড় রং করার নীল (Indigo) পাওয়া যেত নীলের গাছ থেকে। এখন রাসায়নিক কারখানাতেই এই রঞ্জক তৈরি করা যায়। একসময় বিদেশী নীলকররা আমাদের দেশের চাষিদের ধান চাষ করতে না দিয়ে তাদের জমিতে নীলের গাছ চাষ করতে বাধ্য করত। চাষিরা রাজি না হলে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হতো। নিরুপায় চাষিরা শেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই হলো উনবিংশ শতকের নীল বিদ্রোহের ইতিহাস।

আমাদের ব্যবহার করা পেনের কালি বা ছাপার কালিও এধরনের একাধিক রঞ্জকের মিশ্রণে তৈরি।

করে দেখো: একটা ফিলটার কাগজে একফোঁটা জেলপেনের কালি দাও। একটা প্লাস্টিকের ছোটো স্কেলের গায়ে কাগজটা সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়ে ছবির মতো জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। কিছুক্ষণ পরে তুমি কি দেখতে পেলে তা লেখো (ভালো ফল পেতে জলের মধ্যে একটু স্পিরিট দিতে পারো)।

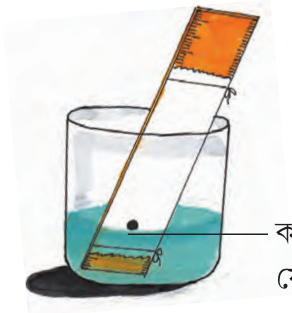

কী করলে	কী দেখতে পেলে

সিমেন্ট

আধুনিক নির্মাণশিল্পের একটি প্রধান উপাদান হলো সিমেন্ট। আমাদের চারপাশে সিমেন্টের বহু জিনিসই আমরা দেখতে পাই। নীচের তালিকায় তোমাদের জানা আরো জিনিসের নাম লেখো, যেগুলোর একটা উপাদান সিমেন্ট।

কী কী জিনিস তৈরিতে সিমেন্ট ব্যবহার হচ্ছে	সিমেন্টের সঙ্গে আরো কীকী জিনিস কাজে লেগেছে বলে মনে হয়
বাড়ি	ইট, বালি, লোহার রড, পাথরকুচি

সিমেন্টের এত ব্যাপক ব্যবহারের কারণ কী জানো? সিমেন্ট সহজলভ্য, তার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও সর্বোপরি সিমেন্টের জিনিসের স্থায়িত্ব বেশি।

সিমেন্ট কি কোনো একটা রাসায়নিক পদার্থ?

সিমেন্টের মধ্যে বেশ কিছু ধাতুর যেমন ক্যালশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রনের অক্সাইড ও সিলিকেট জাতীয় যৌগ মেশানো থাকে। এর উপাদানগুলোর কিছু খনিজ পদার্থ থেকে পাওয়া, যেমন জিপসাম চূর্ণ বা চুনাপাথর থেকে পাওয়া ক্যালশিয়াম অক্সাইড। আবার কিছু কৃত্রিমভাবে তৈরি। তোমরা দেখেছ রাজমিস্ত্রিরা যখন সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন তখন বালি আর সিমেন্ট একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে তাতে জল মেশান।

তুমি যদি সিমেন্ট, বালি আর জল মিশিয়ে একটা দলা পাকিয়ে এক রাত্রি রেখে দাও কী দেখতে পাবে? — পুরোটাই জমাট বেঁধে যাবে।

আবার দেখে থাকবে সিমেন্ট -বালি দিয়ে ইট গাঁথা বা ঢালাই করার পর তাতে বেশ কয়েকদিন জল দেওয়া হয়। জলের সংস্পর্শে সিমেন্টের মধ্যে থাকা ক্যালসিয়াম অক্সাইড, হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন সিলিকেট যৌগের সঙ্গে জল যুক্ত হয়। এইসব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোতে তাপ উৎপন্ন হয় বলে সিমেন্ট ফেটে যায়। তাই ঢালাইয়ের পরদিন থেকেই তার গায়ে জল দেওয়া হয়।

তোমাদের চারপাশের চেনাজানা বহু জিনিসেরই আগে যা উপাদান ছিল তা পালটে সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। নিজেরা আলোচনা করে উদাহরণগুলো লেখো :

কী জিনিস তৈরিতে	আগে কী ব্যবহার হতো	এখন কী ব্যবহার হচ্ছে
গোরুর খড় খাবার গামলা	পোড়া মাটি	
বাড়ি		

কাচ

কর্মপত্র

i) তোমাদের চারপাশে দেখা কাচ ব্যবহার হচ্ছে এমন কয়েকটা জিনিসের উদাহরণ দাও—

.... ।

ii) এই জিনিসগুলো কী কী কাজে লাগে তা লেখো।

.... ।

iii) এই জিনিসগুলোয় কাচ ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা যেত কি? তোমার মতামত লেখো।

.... ।

এই বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কাচ আসলে কি জানো? এটা একটা মিশ্রণ, যা মূলত চুনাপাথর, সোডাভস্ম ও বালি (সিলিকা) থেকে তৈরি করা হয়। রং করার জন্য কাচে বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড মেশানো হয় যাদের সবই কৃত্রিমভাবে তৈরি ।

কাচের কোন রং-এর জন্য	কোন যৌগ কাচে মেশানো হয়
হলুদ	আয়রন অক্সাইড
নীল	কোবাল্ট অক্সাইড
সবুজ	ক্রোমিয়াম অক্সাইড

জানো কি? — রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান - বিজ্ঞানের এইসব শাখা কাচের তৈরি নানান যন্ত্রপাতি ছাড়া এগোতেই পারতনা। কাচ সভ্যতাকে বহু দূর এগিয়ে দিয়েছে। কাচের তৈরি অপটিক্যাল ফাইবার এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। প্লাস্টিকে মোড়া কাচের তন্তু ফাইবারগ্লাসরূপে মূর্তি ও বিভিন্ন ঢালাই করা দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

পরিবেশে সংশ্লেষিত যৌগের প্রভাব

আজ থেকে প্রায় 25-30 বছর আগেও কলকাতা শহরের যত জঞ্জাল ফেলা হতো ধাপার মাঠে। কোন কোন জিনিস তখন ফেলা হতো তার কয়েকটা জিনিসের নাম পরের পাতার তালিকায় দেওয়া হলো। এখনও ধাপার মাঠ যে এলাকায় ছিল, সেখানে কোনো জায়গা খুঁড়লে মাটির নীচ থেকে সেগুলোর কী কী এখনও পাওয়া যাবে আর কোনগুলো যাবে না তা নিজেদের মধ্যে বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

ফেলা জিনিসের তালিকা: ছেঁড়া পলিথিন, চটের ব্যাগ, প্লাস্টিকের ভাঙা খেলনা, ছেঁড়া হাওয়াই চটি, আনাজের খোসা, মাছের আঁশ, ছেঁড়া জামাকাপড়, আখের ছিবড়ে, ডাবের খোলা, কাচের ভাঙা শিশি, ওষুধের মোড়ক, নাইলন দড়ি, লোহার পেরেক, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, পলিথিনের বোতল, পেনসিলের ছোটো টুকরো, বাতিল টিভি, মরা জীবজন্তু ইত্যাদি।

এখন আর কোন কোন জিনিস পাওয়া যাবে না	কোন কোন জিনিস এখনও পাওয়া যাবে	আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরেও কোন কোন জিনিস পাওয়া যাবে

যে জিনিসগুলো এখন আর পাওয়া যাবে না, সেগুলোর কী হলো?

....।

আর যেগুলো পঞ্চাশ বছর পরেও পাওয়া যাবে তাদের কী হবে?

....।

যেগুলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায় তারা **জৈব ভঙ্গুর(বায়োডিগ্রেডেবল)**, আর যারা হয় না তারা **জৈব অভঙ্গুর(নন-বায়োডিগ্রেডেবল)**। এই দুই ধরনের পদার্থ তাদের গঠন, জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। জীবদেহ সম্পূর্ণভাবে জৈব ভঙ্গুর, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট সংশ্লেষিত পলিমারগুলোর অধিকাংশই জৈব অভঙ্গুর।

করে দেখো: নন-বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থগুলোর ব্যবহার কেন কমাতে হবে তা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে একটা পোস্টার তৈরি করো।

তোমাদের স্কুলের বা বাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখো এমন কোনো পদার্থ দেখতে বা তাদের কথা জানতে পারো কিনা যেগুলো দীর্ঘদিন পরিবেশে থেকে যাচ্ছে ও কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও):

কী পদার্থ পড়ে থাকছে	পরিবেশে তার কী প্রভাব পড়ছে

তোমাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণ থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ কীভাবে চারদিকে পলিমারের তৈরি জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে; তারা যেমন জলের গতিপ্রবাহ বা কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা নষ্ট করছে তেমনি তাদের মধ্যে উপস্থিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন উৎসের জলের বর্ণ বা গন্ধের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক কী শুধু প্রয়োগের স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে? — তা নয়, সেখান থেকে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে জল ও বাতাসের দ্বারা। এগুলো কীভাবে ক্ষতি করতে পারে? শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো।

কোন সংশ্লেষিত পদার্থ	কোন জীবের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ছে	কী ক্ষতি ঘটবে
ডিডিটি, মিথাইল প্যারাথায়ন, পেন্টাক্লোরোফেনল	বিশেষ কিছু সিম জাতীয় গাছের মূলে থাকা রাইজোবিয়াম ব্যাকটিরিয়া	
অলড্রিন, হেপ্টাক্লোর	তৃণভোজী প্রাণী (প্রথম শ্রেণির খাদক)	

পরীক্ষা করলে প্রায় প্রত্যেক মানুষের দেহেই কিছু পরিমাণ কীটনাশক পাওয়া যাবে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে, কারণ তাদের অনাক্রম্যতা কম ও বৃদ্ধির হার বেশি।

আমাদের চারপাশে আর শকুন দেখতে পাও কি? পাও না কেন জানত? চাষের কাজে অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ও গবাদি পশুর রোগনিরাময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় ডাইক্লোফেনাক নামক বেদনানাশকের ব্যবহার এর একটা কারণ। এই পশুদের মৃত্যুর পর তা পরবর্তী পর্যায়ের খাদক শকুনের মধ্যে গিয়ে তাদের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে।

ভেবে দেখো : মানুষ যখন প্রথম জাল দিয়ে মাছ ধরা শিখল, তখন কীসের তৈরি জাল ছিল? আর এখন কেন নাইলনের জাল হলো? ফুটবলের গোলপোস্টে কেন নাইলনের জাল বাঁধা হয়? আগে সুতির মশারি ছিল, আর এখন নাইলনের। সুন্দরবনের বাঘ যাতে লোকালয়ে ঢুকতে না পারে তার জন্য আগে লাগানো হতো লোহার জাল, আর এখন লাগানো হচ্ছে উচ্চক্ষমতার নাইলন জাল। নাইলনের জাল ব্যবহারে পরিবেশে কী ক্ষতি হচ্ছে? ছোটো ফাঁদের শক্ত জালে ইলিশের পোনা, কচ্ছপের ছানা মরে গিয়ে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ে চড়ার শক্ত দড়ি অথবা, প্যারাসুটও এই ধরনের তন্তু থেকে তৈরি।

আমাদের দেশে বহু ব্যবহৃত নরম পানীয়গুলোর মধ্যে উদবেগজনক পরিমাণে কীটনাশক পাওয়া গেছে। এই সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী জৈব দূষকগুলো অনাক্রম্যতা কমানো, জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া,বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্যক্ষমতা হ্রাস, স্নায়বিক অনিয়ম, এবং অন্যান্য নানা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তাছাড়া ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক পোকামাকড় মারার জন্য যে সমস্ত কীটনাশক ব্যবহৃত হয় তা তাদের ছাড়াও বহু পরিবেশবান্ধব জীবকেও(মৌমাছি, রেশম মথ) মেরে ফেলে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

বিভিন্ন রং ও রঞ্জক কীভাবে মানুষের ক্ষতি করতে পারে জানো?

এগুলো তৈরি করতে যেসমস্ত ধাতব যৌগ ব্যবহার করা হয় তারা বিভিন্নভাবে আমাদের ক্ষতি করে। যেমন —

কোন ধাতুর যৌগ	কী প্রভাব পড়তে পারে
লেড	খাওয়ার ইচ্ছে কমে যাওয়া, বমিভাব, মাথাধরা।
পারদ	মুখ ও জিভের পেশির সাড়া কমে যাওয়া, বৃক্কের ক্ষতি হওয়া।
ক্যাডমিয়াম	হাড়ের জোড়ে ব্যথা, মেরুদণ্ডের হাড় বেঁকে যাওয়া ।

তোমরা প্রতিদিনের জীবনে যে সমস্ত সংশ্লেষিত পদার্থ ব্যবহার করছ বা তাদের ব্যবহার দেখছ তার পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করা যায় কি? প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও:

এখন কী ব্যবহার করছ	কী ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে হয়
পলিব্যাগ	মোটা কাগজ বা চটের ব্যাগ
অজৈব রং	

5 মানুষের খাদ্য

খাদ্য উপাদান

আমরা সারাদিনে যে যে কাজ করি এসো তার একটা তালিকা নীচের ছবি দেখে তৈরি করি। আচ্ছা, এইসব কাজ করতে গেলে কী প্রয়োজন ?

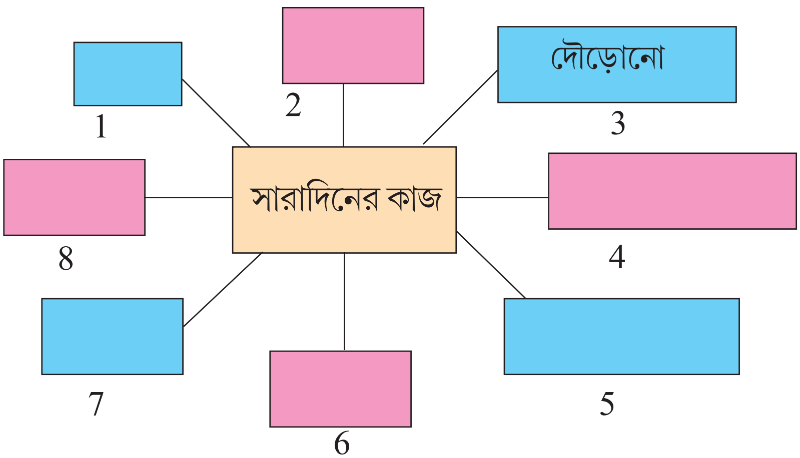

তোমার সামনের টেবিলটা এক হাতে তোলার চেষ্টা করো। না পারলে দু-হাতে তোলার চেষ্টা করো। ওই টেবিলটা তুলতে তোমার দেহে **শক্তি**র প্রয়োজন।

এই শক্তি কোথা থেকে পাও ?

সারাদিন টিফিন না খেয়ে থাকলে, সকালে না খেয়ে স্কুলে এলে তোমার কেমন লাগে ? শরীরে কি জোর পাও ?

....

তাহলে তোমার দেহে শক্তির উৎস কী? ....

ঠিকমতো খাবার খেলে সুস্থ মানুষের শরীরে জীবাণুর সংক্রমণ কম হয়। এবার বলো কীসের অভাবে দেহে রোগজীবাণুর সংক্রমণ অতিমাত্রায় ঘটে এবং শরীর অসুস্থ হয়।

তাহলে বলো, রোগজীবাণুর আক্রমণ ঠেকানো বা তাদের মারার শক্তি কী থেকে আসে? ....।

রোগজীবাণুর আক্রমণ ঠেকানো বা তাদের মারার ক্ষমতা (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতা) বাড়াতে গেলে কী করা উচিত? ....।

এবার বলার চেষ্টা করো:

(1) সারাদিনে নানা কাজ করার জন্য কীসের প্রয়োজন? ....।

(2) নানা রোগ বা সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে গেলে কীসের প্রয়োজন? ....।

এখন এই শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধক উপাদানের উৎস হলো খাদ্য ।

খাদ্যে নানারকম উপাদানের অভাব হলে দেহে নানা সমস্যা হয় । পরবর্তী আলোচনা থেকে কোন খাদ্যে কোন উপাদান আছে তা জেনে নাও।

সমস্যা	খাদ্যের কোন উপাদানের অভাব হয়
রাতে কম দেখা	ভিটামিন
চোখের কোণ ফ্যাকাশে	খনিজ মৌল
ঠোঁটের কোণে ও জিভে ঘা	ভিটামিন
মাড়ি ফোলা ও রক্ত পড়া	ভিটামিন
প্রায়ই হাড় ভেঙে যাওয়া	খনিজ মৌল

তাহলে কীরকমের (উদ্ভিজ্জ / প্রাণীজ) খাবার আমরা খাই? এতে কোন খাদ্য উপাদান বেশি/কম হচ্ছে তা পরবর্তী আলোচনা থেকে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণিতে লেখো।

উদ্ভিজ্জ খাদ্য	কোন খাদ্য উপাদানটি বেশি /কম আছে		প্রাণীজ খাদ্য	কোন খাদ্য উপাদানটি বেশি /কম আছে	
	বেশি	কম		বেশি	কম
চাল, আটা	শর্করা		মধু		
মুড়ি, চিঁড়ে			মাছ	প্রোটিন	শর্করা
ডাল			ছানা		
সয়াবিন			মাংস		
তেল	লিপিড		ডিম		
মাশরুম			দুধ		
সবজি	খনিজ মৌল, তন্তু		চিংড়ি		
ফল	ভিটামিন, খনিজ মৌল	লিপিড	কাঁকড়া		

নীচের খাদ্যতালিকায় কী কী উপাদান থাকতে পারে তাই নিয়ে এসো এবার আলোচনা শুরু করি।

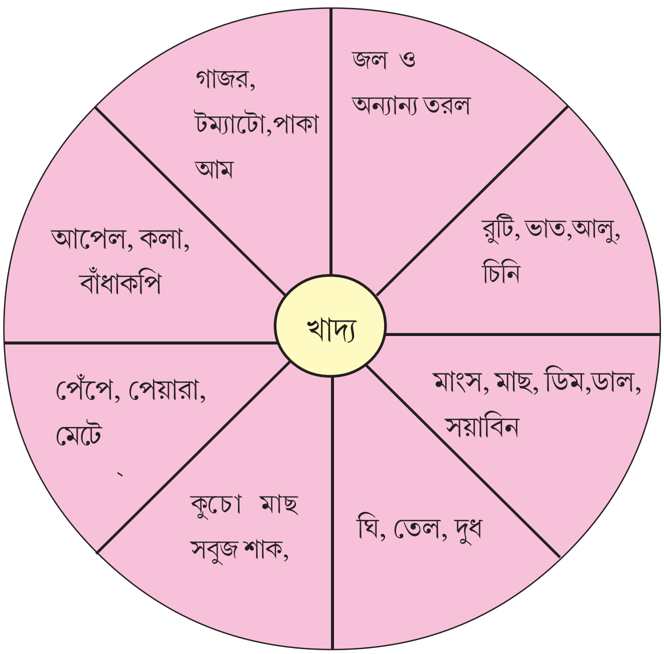

খাদ্যগুলোর প্রধান উপাদান কী ধরনের এসো দেখা যাক —

(1) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (2) প্রোটিন (3) লিপিড (4) ভিটামিন (5) জল (6) খনিজ মৌল (7) খাদ্যতন্তু (8) উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক (ফাইটোকেমিক্যাল)। এর কোনো কোনোটা অনেকটা করে খাওয়া হয়। আবার কোনোটা অল্প করে খাওয়া হয়। কোনো কোনো উপাদান আবার দেহের বিশেষ দরকারে লাগে।

কোন খাদ্যে কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে এসো তার একটি তালিকা তৈরি করি। ফাঁকা জায়গা পূরণ করতে প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

খাদ্য উৎস	প্রধান খাদ্য উপাদান
1. ভাত, রুটি, দুধ, ফল ....., ... , ...	শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
2. মাছ, মাংস, ডিম ....., ... , ...	প্রোটিন
3. মাখন, তেল, বাদাম, নারকেল .... ,	লিপিড
4. পানীয় জল, ফল, সবজি ....,	জল
5. টম্যাটো, আমলকী, আটা, গাজর ....,	ভিটামিন
6. দুধ, নুন, চাল, গুড়, ডাঁটাশাক, মাংস ......,	খনিজ মৌল
7. আম, আপেল, ডাঁটাশাক, পেঁপে, ওট ....,	খাদ্যতন্তু
8. চা, পাকা আম, পাকা পেঁপে ....,	উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক/ ফাইটোকেমিক্যাল

একটি খাদ্য থেকে একাধিক খাদ্য উপাদান পাওয়া যেতে পারে। পাকা আমে ভিটামিন, শর্করা, খনিজ মৌল, খাদ্যতন্তু এবং প্রচুর পরিমাণে জলও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে পরের পাতার আলোচনাগুলো লক্ষ করো ও নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

- দুধে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? প্রোটিন, খনিজ মৌল, শর্করা ...., ...।
- গমে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? খনিজ মৌল, ভিটামিন, প্রোটিন ...., ...।
- আমলকীতে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? ভিটামিন, জল, ..., ...।
- আপেলে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? শর্করা, তন্তু, জল, ..., ...।
- মাছে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? লিপিড, খনিজ মৌল, ভিটামিন ...., ...।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা

ওপরের ছবিগুলোতে বিভিন্ন শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদানের উৎসগুলো দেখো। এর মধ্যে —

- কোন কোন উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে শর্করা পাওয়া যায়— আলু ...., ..., ..., ...।
- কোন কোন প্রাণীজ খাদ্য থেকে শর্করা পাওয়া যায়— মেটে, ..., ..., ..., ...।

কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্যদের নীচের শ্রেণিগুলোতে ভাগ করা যেতে পারে —

(1) মিষ্টি খাদ্যবস্তু — আখ, মধু, পাকা আম, পাকা কলা, আঙুর, আপেল, ..., ..., ...।

(2) দানাশস্য — চাল, গম, জোয়ার, বাজরা, ..., ..., ..., ...।

(3) মূল ও কন্দ — বীট, আলু, গাজর, রাঙা আলু, শাঁকালু, ..., ..., ...।

(4) সবুজ শাকসবজি — লালশাক, নটেশাক, ..., ..., ...।

(5) বিভিন্ন প্রকার ডাল — মুসুর, মুগ, ..., ..., ...।

(6) প্রাণীজ খাদ্যবস্তু — মধু, দুধ, ..., ..., ...।

দেহগঠনের জন্য খাদ্য থেকে যেসব শর্করা আমরা ব্যবহার করি তা প্রধানত দু-ধরনের — গ্লুকোজ এবং স্টার্চ বা শ্বেতসার। অনেক গ্লুকোজ অণু জুড়ে শ্বেতসার তৈরি হয়।

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো কার্বোহাইড্রেটের উৎসরূপে যে খাদ্যগুলোকে আমরা চিহ্নিত করলাম, তাদের ছাড়াও নীচের খাদ্যগুলোতে কার্বোহাইড্রেট আছে কিনা (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

খাদ্য	উপস্থিত/ অনুপস্থিত
1. কুমড়ো	
2. কিশমিশ	
3. আতা	
4. জাম	
5. ডিম	
6. জিরা	উপস্থিত
7. দই	
8. কেক	
9. ঘি	
10. চিঁড়া	

এসো এবার মনে করি, আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কী কী কাজ করে।

হাত-পায়ের পেশি কী কাজ করে?

হৃৎপিণ্ড কী কাজ করে?

ফুসফুস কী কাজ করে?

অন্ত্র কী কাজ করে?

এইসব কাজ করার শক্তি পাওয়া যায় কোথা থেকে?

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার (শ্বেতসার) হজম হবার পর যখন সব থেকে ছোটো কণাতে পরিণত হয়, তাই হলো গ্লুকোজ। সেই গ্লুকোজ আবার শরীরের সমস্ত অংশের সীমানায় পৌঁছে যায় রক্তের মাধ্যমে। সেখানে কোশের ভেতর বাতাস থেকে নেওয়া অক্সিজেনের সাহায্যে সেই গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় শক্তি, যা দিয়ে দেহের নানা কাজ হয়।

শর্করা ও দেহের সমস্যা

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের দেহকোশ গ্লুকোজ থেকে শক্তি তৈরি করে। সেই শক্তি দিয়ে দেহের নানা কাজ হয়। কিন্তু রক্ত থেকে গ্লুকোজ যদি কোশে প্রবেশই না করতে পারে? ওই গ্লুকোজ তখন রক্তে জমে, আর রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যায়। গ্লুকোজ তখন রক্তের মাধ্যমে ঘুরতে থাকে, যতক্ষণ না তা মুত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। কোশে গ্লুকোজ ঢুকতে না পারার জন্য দেহের নানা অঙ্গে (হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, চোখ, পা) সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় মধুমেহ বা ডায়াবেটিস। আমাদের দেশের অনেক মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন। কায়িক পরিশ্রম বাড়িয়ে এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে অনেকক্ষেত্রে এই রোগকে এড়ানো যায়।

কোনো কোনো শিশু কিংবা বয়স্ক ব্যক্তি দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার পর নানা সমস্যায় ভোগেন। দুগ্ধ শর্করা ল্যাকটোজ হজম না করতে পারার জন্য এই সমস্যা।

প্রোটিন

এসো দেখি, কোথায় কোথায় থাকে প্রোটিন। মনে রেখো মানুষের দেহের প্রোটিন দিয়ে তৈরি টেনডন ও লিগামেন্ট খুব শক্ত দড়ির মতো, টানলে ছেঁড়ে না। আবার মুরগি বা হাঁসের ডিমের সাদা অংশে থাকা প্রোটিন দ্রবণ গরম করলে জমে শক্ত হয়ে যায়।

নীচের ছকে মানুষের দেহে কোথায় কোথায় কী কী প্রোটিন পাওয়া যায় তা দেখি।

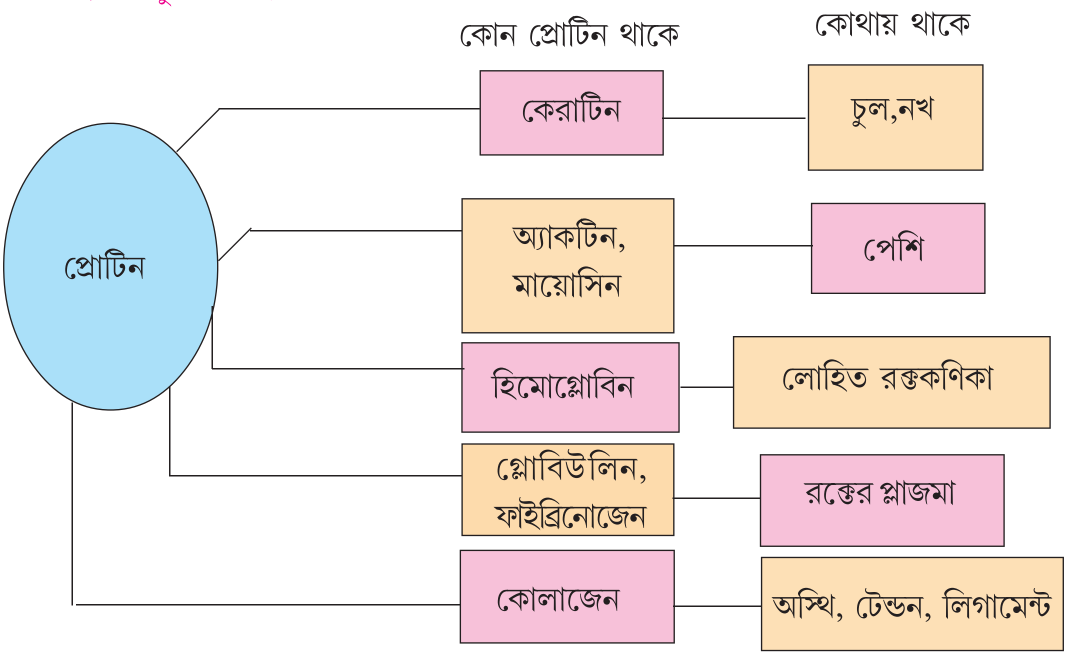

শক্তি উৎপন্ন করতে,দেহের বিভিন্ন অংশ বা কলা গঠনে, ক্ষত সারাতে, শ্বাসবায়ু পরিবহণে, পেশির সংকোচনে, ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের রোগ প্রতিরোধেও প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো জায়গা কেটে গেলে, ওই জায়গা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করতেও রক্তের প্লাজমায় থাকা প্রোটিন সাহায্য করে। আবার অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরে জমা হলে বাত, কিডনি স্টোন ও অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়।

কোন কোন খাদ্য থেকে আমরা প্রোটিন সংগ্রহ করি তা নীচের ছবিগুলো দেখে তা নিচের তালিকায় লেখো:

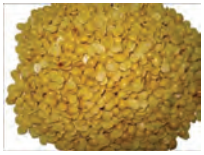

ওপরের ছবিগুলো দেখে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়—

(i) কোন কোন উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়—— সয়াবিন, ..., গম, ..., ..., ...

(ii) কোন কোন প্রাণীজ উৎস থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়—— মাছ, মাংস, ডিম, ...

উপরের ছবিগুলো ছাড়া আমাদের খাদ্যতালিকায় এমন কতগুলি খাদ্য আছে যা থেকেও প্রোটিন পাওয়া যায়—

উদ্ভিজ্জ উৎস	প্রাণীজ উৎস
1. চাল, সিম, কাঁঠাল বীজ, ...,	1. ছানা, পনির, ...,
2. বাজরা, ভুট্টা, ...,	2. কাঁকড়া, ...,
3. রসুন, লবঙ্গ, এলাচ, ধনে, হলুদ, ...,	3. দুধ, ...,

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো প্রোটিনের উৎসরূপে যে খাদ্যগুলোকে আমরা চিহ্নিত করলাম, তাদের ছাড়াও নীচের খাদ্যগুলোতে প্রোটিন আছে কিনা (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

খাদ্য	উপস্থিত/ অনুপস্থিত
(1) চাল, গম	
(2) ঘি	
(3) চিনাবাদাম	
(4) তিল	
(5) কলা	
(6) মাশরুম	
(7) সুজি	
(8) পিঁপড়ের ডিম	

লিপিড

একজন স্থূল বা মোটা মানুষকে লক্ষ করো। দেখো তার দেহের বিশেষ কতগুলো জায়গায় লিপিড প্রচুর পরিমাণে জমা থাকে। এই লিপিডযুক্ত দেহের অংশগুলো হলো-

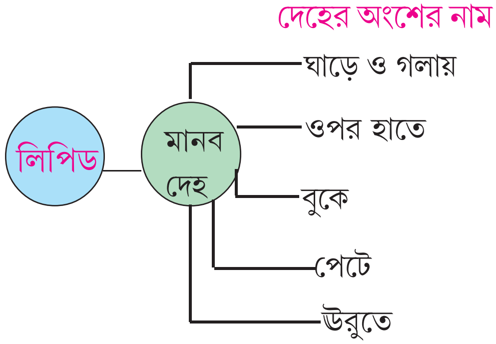

লিপিড মানুষের দেহে শক্তির উৎসরূপে কাজ করে, দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। দেহের থেকে তাপ বেরিয়ে যাওয়া কমিয়ে দেয়। আবার শরীরে অতিরিক্ত লিপিড জমা হলে হৃৎপিণ্ড, রক্তনালী ও যকৃতের নানা সমস্যা তৈরি হয়।

কোন কোন খাদ্য থেকে আমরা লিপিড সংগ্রহ করি তা নীচের ছবিগুলোতে দেখো ও লেখো।

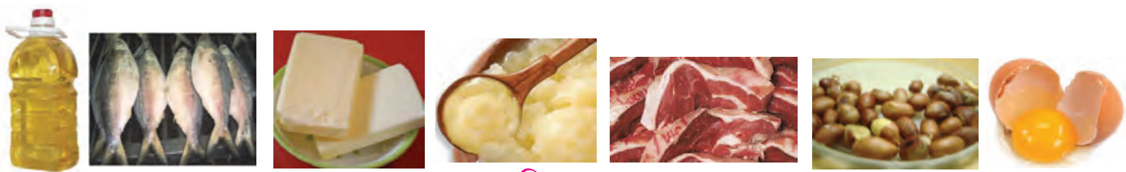

......., ..., ..., ঘি ...., বাদাম ....,

উপরের ছবিগুলো ছাড়া আমাদের খাদ্য তালিকায় ব্যবহৃত এমন কতগুলো খাদ্য আছে যা থেকেও লিপিড পাওয়া যায়—

উদ্ভিজ্জ উৎস	প্রাণীজ উৎস
1. নারকেল, কাঁঠাল, ...,	1. মাছের তেল, ...,
2. ডাল, আটা, ...,	2. দুধ, দই, ...,
3. গোলমরিচ, জোয়ান, ...,	3. মাংস, ...,

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো লিপিডের উৎসরূপে যে খাদ্যগুলোকে আমরা চিহ্নিত করলাম, তাদের ছাড়াও নীচের খাদ্যগুলোতে লিপিড আছে কিনা (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

খাদ্য	উপস্থিত/অনুপস্থিত
1. ফল ও শাকসবজি	
2. দানাশস্য	
3. সর ওঠানো দুধ	

খাদ্য /পানীয়	উপস্থিত/অনুপস্থিত
4. পপকর্ন	
5. আলু	
6. আখের রস	
7. লেবু	
8. গম, ভুট্টা, চাল	
9. মাশরুম	
10. মুরগির মাংস	
11. খেজুর	

ভিটামিন

আজ থেকে 500 বছর আগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একটা খুব প্রচলিত রোগ ছিল স্কার্ভি। জাহাজের নাবিকদের অনেকেই এই রোগে মারা যেত। তাই জাহাজে কমলালেবু ও অন্যান্য টক জাতীয় ফল নাবিকদের খেতে দেওয়া হতো।

এরকম নানা ঘটনা লক্ষ করে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী কাসিমির ফাংক ও হপকিন্স সিদ্ধান্তে আসেন যে খাদ্যের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিড ছাড়াও 'এমন কোনো' উপাদান আছে যার অভাবে স্কার্ভি বা বেরিবেরির মতো রোগ হয়। এই উপাদানটি হলো ভিটামিন। এদের থেকে শর্করা, প্রোটিন বা লিপিডের মতো শক্তি পাওয়া যায় না।

ভিটামিন দু-ধরনের —

1. তেলে বা ফ্যাটে গুলে যায় (ফ্যাটে দ্রাব্য) এমন ভিটামিন — A, D, E ও K ।

2. জলে গুলে যায় (জলে দ্রাব্য) এমন ভিটামিন — B কমপ্লেক্স, C ।

A, D, E ও K ভিটামিনগুলো মানুষের দেহে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

ভিটামিনের নাম	কাজ
A	চোখ, চামড়া, হাড়, দাঁত ও খাদ্যনালীর গঠন ঠিক রাখতে সাহায্য করে।
D	হাড় ও দাঁতের স্বাভাবিক গঠন ঠিক রাখে।
E	ত্বক,লোহিত রক্তকণিকা, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের সক্রিয়তা বজায় রাখে।
K	কেটে যাওয়া জায়গা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করে ।

এখন পরের পাতার খাদ্য উৎসগুলোর ছবি লক্ষ করো এবং জানো এর মধ্যে কোনগুলো A, D, E, K ভিটামিনের উৎস ।

ভিটামিন A- র উৎস

ভিটামিন D- র উৎস

ভিটামিন E- র উৎস

ভিটামিন K- র উৎস

উপরের ছবিগুলো ছাড়াও আমরা আরও নানাধরনের খাদ্য খেয়ে থাকি যা থেকেও তেলে বা ফ্যাটে গুলে যায় এমন ভিটামিন পাওয়া যায়। সেগুলো হলো—

উদ্ভিজ্জ উৎস	প্রাণীজ উৎস
পাকা আম, কুমড়ো, ডুমুর, ডাঁটাশাক, জিরা, জোয়ান, জলপাই, ধনেপাতা, নটেশাক,তেল,ডাল,........., ...	মাংস, ঘি, ছানা, কাঁকড়া, ..., ..., ..., ..., ..., ...

নীচের ক্ষেত্রগুলোতে কোন কোন ভিটামিনের সাহায্য নেবে (A, D, E, K)?

সমস্যা	ভিটামিনের নাম
1. রাতে দেখতে কষ্ট হয়।	1.
2. হাড়গুলো বাঁকা ও মেরুদন্ড বেঁকে গেছে।	2.
3. ক্ষতস্থানে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না।	3.

- **জলে দ্রাব্য ভিটামিন**

এবার এসো দেখি তোমাদের পরিচিত কোন কোন খাদ্য উৎসে জলে দ্রাব্য ভিটামিনগুলো পাওয়া যায়—

ওপরের ছবিগুলো দেখে নীচের ছকটি পূরণ করো। তোমার জানা অন্যান্য খাদ্য উৎসের নাম তালিকায় যোগ করো।

জলে দ্রাব্য ভিটামিনের নাম	খাদ্য উৎস
1. ভিটামিন C	লেবু জাতীয় ফল, অঙ্কুরিত বীজ, কাঁচালঙ্কা, টম্যাটো, পেয়ারা ....,.......... ,
2. ভিটামিন B কমপ্লেক্স	দানাশস্য, বাঁধাকপি, মুলোশাক, ছোটোমাছ, কাঁচালঙ্কা, দুধ ...., ...,

এবার নীচের সারণির বাম দিকে কতকগুলো উপসর্গ দেওয়া হলো। জলে গুলে যায় এমন কোন ভিটামিনের অভাবে কোন রোগ হয় এসো তা দেখি।

উপসর্গের নাম	ভিটামিনের নাম
1. ঠোঁট ফেটে যাওয়া	i. B কমপ্লেক্স
2. চোখের নীচ ও নখ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া	ii. B কমপ্লেক্স
3. মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, দাঁত পড়ে যাওয়া	iii. C
4. স্নায়ুর দুর্বলতা	iv. B কমপ্লেক্স
5. অ্যানিমিয়া, পাতলা পায়খানা, স্মৃতিভ্রংশ হওয়া	v. B কমপ্লেক্স

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো ভিটামিনের উৎসরূপে যে খাদ্যগুলোকে আমরা চিহ্নিত করলাম, তাদের ছাড়াও পরের পাতার খাদ্যগুলোতে জলে দ্রাব্য ভিটামিন আছে কিনা (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

খাদ্য	উপস্থিত/অনুপস্থিত
1. রুটি, ভুট্টা	
2. পটোল, ঝিঙে	
3. কলমিশাক	
4. লাউপাতা	
5. স্কোয়াশ, পাকা পেঁপে	
6. জাম, তরমুজ, শশা	
7. আলু	
8. ডিমের সাদা অংশ	
9. পনির, মেটে	

খনিজ মৌল

নীচের ঘটনাগুলো ভাবো ও এর সঙ্গে কোন খাদ্য উপাদান যুক্ত থাকতে পারে বোঝার চেষ্টা করো।

● নখ চামচ আকৃতির হয়। ● মাঝেমাঝেই পেশিতে টান ধরে। ● দেহের স্বাভাবিক রক্তচাপ হঠাৎ বেড়ে বা কমে যায়। ● জন্মের পর অনেক শিশুর চোখ ট্যারা হয় ও মানসিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায় না। ● রক্তে শর্করার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

এই সমস্যাগুলো কার্বোহাইড্রেট, লিপিড বা প্রোটিনের অভাবে ঘটে না।

এই সমস্যাগুলো ফ্যাটে বা জলে গুলে যায় এমন ভিটামিনের অভাবেও ঘটে না।

তবে কি এই সমস্যাগুলো অন্য কোনো খাদ্য উপাদানের অভাবে ঘটে ? এসো জানা যাক।

এই প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান হলো খনিজ মৌল। এরকম দরকারি খনিজ মৌলগুলো হলো — আয়রন, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, আয়োডিন ও জিঙ্ক। এছাড়াও শরীর গঠনে অন্যান্য খনিজ মৌলেরও প্রয়োজন হয়। ভিটামিনের মতো খনিজ মৌল থেকেও শক্তি পাওয়া যায় না।

জড় বা সজীব উপাদান থেকে খাদ্য উপাদান খনিজ মৌল পাওয়া যায়।

- উদ্ভিদ প্রধানত মাটি বা মাটির নীচে থাকা জল থেকে খনিজ মৌল সংগ্রহ করে।
- প্রাণীরা বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাদ্য, প্রাণীজ খাদ্য বা জল থেকে খনিজ পদার্থগুলো সংগ্রহ করে।

পরের পাতার মানবদেহের কাজগুলোর সঙ্গে কি তোমার পরিচিতি আছে? না থাকলে পরিচিত হওয়ার ও বোঝার চেষ্টা করো। শরীরের এই কাজগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন খনিজ মৌল সম্পর্কযুক্ত। ডানদিকে মৌলগুলোর নাম আর বাঁদিকে ওই মৌলগুলোর কাজ দেওয়া হলো।

খনিজ মৌলের কাজগুলো কী কী?

কাজ	খনিজ মৌলের নাম
• দেহে জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখা	সোডিয়াম
• পেশি সংকোচন স্বাভাবিক রাখা	ক্যালশিয়াম
• কোনো কাটা জায়গা দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করলে রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করা	ক্যালশিয়াম
• অক্সিজেন পরিবহণ করা	আয়রন
• দাঁত ও হাড় গঠন করা	ক্যালশিয়াম,ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম
• মানসিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা	আয়োডিন
• মস্তিষ্কের গঠন ও রক্তের শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা	জিঙ্ক

নীচে বিভিন্ন খাদ্যের ছবি দেওয়া হলো। এবার পরিচিত হও কোন খাদ্য থেকে আমরা কোন খনিজ মৌল পেয়ে থাকি। তোমার জানা অন্যান্য খাদ্য উৎসের নাম তালিকায় যোগ করো।

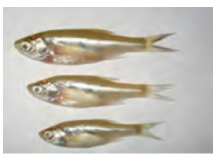

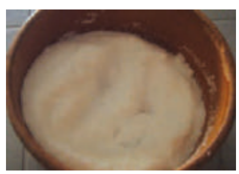

খনিজ মৌলের নাম	পানীয় / খাদ্য উৎসের নাম
1. ক্যালশিয়াম, ফসফরাস	দুধ, ডিম, চিংড়ি, পাকা পেঁপে, পটোল, ..., ...,
2. ম্যাগনেশিয়াম	শাকসবজি, ..., ...
3. আয়রন	যকৃৎ, চিংড়ি মাছ, আমলকী, শশা, চিচিঙ্গে ....,
4. সোডিয়াম	নুন, পানীয় জল, ...
5. আয়োডিন	নুন, ..., ...
6. জিঙ্ক	শাকসবজি, ..., ...

মানুষের দেহে খনিজ মৌলের অভাবে কতকগুলো সমস্যা তৈরি হয়। এসো জানি কোন খনিজ মৌলের সঙ্গে কোন রোগের সম্পর্ক আছে।

রোগ	রোগ সম্পর্কিত খনিজ মৌল
1. উচ্চ রক্তচাপ	সোডিয়াম
2. অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা, চামচ আকৃতির নখ	আয়রন
3. গলগণ্ড বা গয়টার	আয়োডিন
4. বারবার হাড় ভেঙে যাওয়া, বেঁকে যাওয়া, হাড় ফুটো ফুটো হওয়া, দাঁতের সমস্যা	ক্যালশিয়াম, ফসফরাস
5. রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া	জিঙ্ক

জল

(i) কোন খাদ্য উপাদানকে আমরা তরলরূপে গ্রহণ করি? ....।

(ii) যে-কোনো জীবদেহ গঠনের একটি প্রধান উপাদান হলো জল। একজন মানুষের ওজন 70 কেজি হলে দেহে জল থাকে প্রায় 45 কেজি। ওই পরিমাণ জলকে শতাংশের হিসাবে প্রকাশ করো। ....

- দেহে ব্যবহৃত জল আমরা কোথা থেকে পাই —

  (i) পানীয় জলের মাধ্যমে, (ii) ফলের রস থেকে (তরমুজ, ..., ...)

  (iii) বিভিন্ন খাদ্য থেকে (ভাত, ..., ...) (iv) বিভিন্ন তরল পানীয় থেকে (ডাবের জল, ..., ...)।

- কোন কোন অবস্থায় দেহে জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়?

  (i) অনেকটা ঘাম অথবা বারবার পাতলা পায়খানা হলে। (ii) ....।

কী ঘটনা ঘটতে পারে :

1. তুমি যদি পানীয় জলের পরিবর্তে সমুদ্রের জল ক্রমাগত পান করতে থাকো।
2. তুমি নুন মাখানো বিস্কুট, বাদাম বা কাঁচা আমের টুকরো খাও।

খাদ্যতন্তু

আমরা যে খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করি তার কী পরিণতি হয় খাদ্যনালীতে?

খাদ্য হজম হয়। হজম হওয়া খাদ্যের শোষণ হয়। যে খাদ্য হজম হয় না তা মল হয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

মলের মধ্যে তন্তু থাকে যা খাদ্যনালীতে কোনোভাবেই হজম করা যায় না। তন্তু এক ধরনের সেলুলোজ বা পেকটিন জাতীয় কার্বোহাইড্রেট। এটি জলে গুলে যেতেও পারে। আবার নাও যেতে পারে। মানুষের দেহ এদের ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না। নীচের খাবারগুলোতে বেশি পরিমাণে তন্তু থাকে।

(i) সজনে ডাঁটা, (ii) বাঁধাকপি, (iii) চাল, (iv) আপেল, (v) বীজের খোসা, (vi) ওট।

শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে তন্তুজাতীয় খাদ্য উপাদানের আরো কয়েকটি উৎস জানার চেষ্টা করো।

(i) ...., (ii) ...., (iii) ...., (iv) ...., (v) ....।

তন্তুসমৃদ্ধ খাদ্য খেলে কতকগুলো রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়— উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলত্ব, অন্ত্রের ক্যানসার ও কোষ্ঠকাঠিন্য।

ফাইটোকেমিক্যালস বা উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক

তুমি নীচের নানা রঙের খাদ্যগুলোকে ছবি দেখে চেনার চেষ্টা করো।

(i) .... (ii) ...., (iii) ...., (iv) ...., (v) ...., (vi) ...., (vii) ....

(viii) .... (ix) ...., (x) বিট, (xi) চা, (xii) ....।

আগের পাতার খাদ্যগুলো প্রত্যেকটি রঙিন। এদের মধ্যে নানা রঙের উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক যৌগ থাকে। যেমন — ক্যারোটিনয়েডস বা ফ্ল্যাভোনয়েডস। এরা মানবদেহের খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাওয়া আটকায়। হৃৎপিণ্ডের কাজ ঠিকঠাক রাখে। আর হাড়কে শক্ত রাখে। ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি- খাদ্য উপাদানগুলো নীচের বিভিন্ন খাদ্যের শ্রেণিবিভাগের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে।

খাদ্যের শ্রেণি	বিভিন্ন প্রকার খাদ্য	খাদ্য উপাদান
1. দানাশস্য ও তা থেকে উৎপন্ন খাদ্য	চাল,.......,গম,...., ..., ..., ভুট্টা, ..., ..., ..., ...	কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ..., ..., ..., ...,.........,
2. ডাল ও শুঁটি জাতীয় খাদ্য	মুগ, ..., সয়াবিন, ..., ..., ...	প্রোটিন, ভিটামিন, ..., ..., ...
3. দুধ, মাছ, ডিম ও মাংস জাতীয় খাদ্য	দুধ, দই, ..., মাখন তোলা দুধ, ..., ..., ..., ...	প্রোটিন, খনিজ মৌল, ..., ..., ...
4. শাকসবজি ও ফলমূল	আম, পেঁপে, পালং, ..., ...	ভিটামিন, তন্তু, ..., ..., ...
5. মিষ্টি ও তেল	আখ, সরষের তেল, ..., ..., ..., ..., ...	কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ...., ..., ..., ...,

কোন কোন খাদ্য উপাদানগুলো তোমাদের অবশ্যই খেতে হবে যদি তোমরা সুস্থ থাকতে চাও?

....।

কোন খাদ্য উপাদানগুলো কোন কোন খাদ্য থেকে পাবে, তাদের নাম নীচের সারণিতে লেখো :

খাদ্য উপাদান	খাদ্যের নাম
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

পরের পৃষ্ঠায় লেখা মানুষের যে যে শারীরিক সমস্যা আছে, তা এড়াতে কোন কোন খাদ্য খাওয়া উচিত তা ছকে লেখো।

শারীরিক সমস্যা	কোন খাদ্য খাবে	তা থেকে কোন খাদ্য উপাদান পাবে
মাড়ি ফুলে রক্ত ঝরছে		
দেহে রক্তাল্পতা হয়েছে		
হাড়গুলো দুর্বল, বাঁকা		
কোষ্ঠকাঠিন্য		
রাতে কম দেখতে পাচ্ছে		
মুখে আর জিভে ঘা		
চামড়া কুঁচকে গেছে		
রক্তচাপ হঠাৎ বেড়ে গেছে		

নীচে তিনদিনের খাদ্যতালিকা দেখো। কোনো খাদ্য উপাদানের অভাব ঘটলে তা চিহ্নিত করো ।

1 নং তালিকা—

প্রথম দিন	রুটি, গুড়, ভাত, ডাল, তরকারি, মুড়ি, মাছের ঝোল, জল
দ্বিতীয় দিন	পাঁউরুটি, ডিমসেদ্ধ, কলা, ভাত, মাখন, তরকারি, আমের চাটনি, জল
তৃতীয় দিন	ভাত, মাছের ঝোল, শাক, মিষ্টি, শশা, আলুসেদ্ধ

2 নং তালিকা—

প্রথম দিন	এগরোল, চকোলেট, রুটি, ঘি, ডাল, আলুভাজা,সবজি
দ্বিতীয় দিন	পাঁউরুটি, কুকিজ, পেস্ট্রি, পরোটা, মাংস, হালকা পানীয়, ডিম
তৃতীয় দিন	ভাত, দুধ, সবজি, ফল, কেক, কুমড়ো সেদ্ধ, পেস্ট্রি

দেহ সুস্থ রাখতে গেলে, নামীদামি কোন কোন খাবারের বদলে আর কী কী খেতে পারো ?

- আপেলের বদলে ....। (পাকা পেঁপে/পাকা পেয়ারা/পাকা আমড়া/পাকা কুল)
- মাংস বা ডিমের বদলে ....। (ডাল/সিম/ছোলা বা মটর/মাশরুম/সয়াবিন)
- দুধ, ছানা আর হেলথ ড্রিঙ্কের বদলে ....। (ছাতুর শরবত/লেবুর জল/বেলের শরবত/চিনির শরবত)।
- আয়রন টনিকের বদলে .... (নটেশাক/কাঁচা পেয়ারা/সজনে পাতা/কচুশাক)

পরের পৃষ্ঠায় কতকগুলো খাদ্যের নাম দেওয়া আছে। এগুলো থেকে তুমি কোন কোন খাদ্য উপাদান পেতে পারো (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

1. পাকা আম : খাদ্যতন্তু, ..., ..., ... ।
2. দুধ : প্রোটিন, ..., ..., ... ।
3. বাদাম : লিপিড, ..., ..., ... ।
4. ডিম : খনিজ মৌল, ..., ..., ... ।
5. পেয়ারা : ভিটামিন, ..., ..., ... ।
6. দই : ভিটামিন, ..., ..., ... ।
7. টম্যাটো : উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক, ..., ..., ... ।
8. চাল : কার্বোহাইড্রেট, ..., ..., ... ।
9. পালংশাক : ভিটামিন, ..., ..., ... ।
10. আমলকী : খনিজ মৌল, ..., ..., ... ।

ওপরের খাদ্যগুলো চিহ্নিত করো। ওই খাদ্যগুলোতে কোন কোন খাদ্য উপাদান পাওয়া যেতে পারে তা লেখো।

1. : ...., ..., ..., ... ।
2. : ...., ..., ..., ... ।
3. : ...., ..., ..., ... ।
4. : ...., ..., ..., ... ।
5. : ...., ..., ..., ... ।
6. : ...., ..., ..., ... ।
7. : ...., ..., ..., ... ।
8. : ...., ..., ..., ... ।

অপুষ্টি ও স্থূলত্ব

নীচের ছবিগুলোকে লক্ষ করো ও সমস্যাগুলো জানো।

1. গয়টার

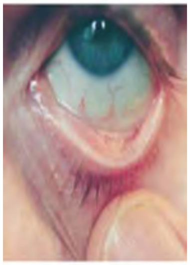

2. অ্যানিমিয়া

3. ট্যারা চোখ

4. অন্ধত্ব

5. ম্যারাসমাস

ওপরের অসুস্থ ব্যক্তি ও শিশুদের দেহে এই সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যে এক বা একাধিক অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের **গুণগত** বা **পরিমাণগত** অভাবে ঘটতে পারে।

ছবির প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুগুলি নানা রোগে আক্রান্ত। রোগের মূল কারণ অপুষ্টি। অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলি হলো—

- আয়োডিনের অভাব (**গয়টার**)।
- আয়রনের অভাব (**অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা**)।
- আয়োডিনের অভাব (**ট্যারা চোখ**)।
- ভিটামিন A এর অভাব (**অন্ধত্ব**)।
- প্রোটিন ও শক্তির অভাব (**ম্যারাসমাস**)।

রক্তাল্পতা : নানা কারণে রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বা লোহিত রক্ত কণিকায় থাকা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। হিমোগ্লোবিন কোশে কোশে অক্সিজেন সরবরাহ করে। হিমোগ্লোবিন কম থাকলে কোশগুলোর শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধা পায়। সামগ্রিকভাবে মানুষটি দুর্বল হয়ে পড়েন। এটাই রক্তাল্পতা। রক্তাল্পতা নানা কারণে হতে পারে। যেমন— অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, জীবাণুর সংক্রমণ, হিমোগ্লোবিন বা লোহিত রক্ত কণিকা সংশ্লেষের উপাদানের অভাব (হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে আয়রন আর লোহিত রক্ত কণিকার ক্ষেত্রে ভিটামিন B_{12})।

খাদ্যে শক্তি উৎপাদক খাদ্য উপাদানগুলোর অভাব ঘটলে অপুষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের শক্তি উৎপাদক উপাদানগুলো হলো কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিড। এছাড়া শক্তি উৎপাদক নয় এমন খাদ্য উপাদানের (ভিটামিন ও খনিজলবণ) অভাবেও অপুষ্টিজনিত নানা সমস্যা দেখা যায়। কৃমির সমস্যা থাকলেও অপুষ্টি হতে পারে। অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা শিশুদের খাদ্যতালিকায় কোন কোন উপাদান তুমি যোগ করবে?

(1) কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

(2) প্রোটিনযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

(3) লিপিডযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

(4) ভিটামিনযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

(5) খনিজ মৌলযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

অপুষ্টির ফলে শিশুর দেহে কী কী উপসর্গ দেখা যায়?

পাশের ছবিতে শিশুটিকে লক্ষ করো। দেখে শিশুটির উপসর্গগুলো নীচে লেখো।

- দেহের .... গুলির খুব বেশি ক্ষয় হয়েছে।
- .... বাইরে থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।
- .... জায়গায় জায়গায় কোঁচকানো।
- হাত, পাগুলো খুব .... ।

শব্দভান্ডার : সরু, পেশি, হাড়, চামড়া

শিশুদের এই অপুষ্টিজনিত রোগটি হলো **ম্যারাসমাস**। খাদ্যে প্রোটিন ও শক্তি উভয়ের অভাব ঘটলে এই রোগ হয়। এক বছরের কম বয়স্ক শিশুদের মধ্যে সাধারণত এই রোগ দেখা যায়।

পাশের ছবিটি লক্ষ করো। শিশুটির চামড়া গাঢ় বর্ণের ও পেট ফোলা। দেখে মনে হয় যেন চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিনের অভাব ঘটলে 1-4 বছর বয়স্ক শিশুদের যে অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা যায় তাহলো **কোয়াশিওরকর**।

এই ধরনের শিশুদের সুস্থ করতে তুমি কোন কোন খাদ্য নির্বাচন করলে তার তালিকা তৈরি করো।

1. .... 2. .... 3. ....

ম্যারাসমাস ও **কোয়াশিওরকর** ছাড়াও শিশুদের অপর কিছু প্রধান অপুষ্টিজনিত সমস্যা হলো :

1. **আয়রনের অভাবজনিত রোগ** — অ্যানিমিয়া, চামচ আকৃতির নখ
2. **আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ** — গয়টার, জড়বুদ্ধি, ট্যারা চোখ
3. **ভিটামিন D এর অভাবজনিত রোগ**— রিকেট
4. **ভিটামিন B কমপ্লেক্স এর অভাবজনিত রোগ**— বেরিবেরি
5. **ভিটামিন A এর অভাবজনিত রোগ**— অন্ধত্ব

কী করে সারানো যায় এই অসুখ ?

- লৌহসমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ (পেয়ারা, আম, আটা, চিঁড়া, গুড়, কিশমিশ, গোলমরিচ, জোয়ান, জিরা, তিল, কচু, নটেশাক, ধনেপাতা, পালংশাক, পেঁয়াজকলি, কলমিশাক, মুলোশাক................, ..., ...)
- আয়োডিনসমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ (আয়োডিনযুক্ত খাদ্যলবণ , ..., ..., ...,)
- ভিটামিন **B কমপ্লেক্স** যুক্ত খাদ্যগ্রহণ (ঢেঁকিছাঁটা চাল. সবুজ শাকসবজি, ..., ...,)
- ভিটামিন **D** যুক্ত খাদ্যগ্রহণ (দুধ,..........................., ..., ...,)
- ভিটামিন **A** যুক্ত খাদ্যগ্রহণ (পাকা আম, কমলালেবু, গাজর, কুল, কাঁঠাল, ছানা, ডিম, ধনেপাতা, নটেশাক, মুলোশাক ...., ..., ...)।

নীচের উপসর্গগুলি নানা খাদ্য উপাদানের অভাবে ঘটে। কোন কোন খাদ্য খেলে এই সমস্যাগুলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা নীচের তালিকায় লেখো।

উপসর্গের নাম	কোন খাদ্য উপাদানের অভাবে ঘটে	কোন খাদ্যে ওই খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়
হাত পা বাঁকা	ভিটামিন D	
চোখের মণিতে সাদা দাগ	ভিটামিন A	
পেছনের সারি থেকে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়তে পারে না	ভিটামিন A	
জিভে, মুখের কোণে ঘা, মাড়ি ফোলা	ভিটামিন B কমপ্লেক্স	
ফোলা মুখ	প্রোটিন	
ভাঙা নখ	ক্যালশিয়াম	
খসখসে চামড়া	ভিটামিন A	

এতক্ষণ আমরা অপুষ্টির জন্য কী কী অসুখ হতে পারে জানলাম। এবার আমরা জানাব টিটু, জনদের সমস্যা।

মিমোর খাদ্যাভ্যাস

1. ভাত বা রুটি 2. ডাল
3. শাক 4. সবজি 5. ফল
6. দুধ 7. তেল, 8. মাছ, মাংস বা ডিম

টিটুর খাদ্যাভ্যাস

1. ভাত বা পরোটা
2. সবজি 3. দুধ
4. তেল 5. পাঁঠার মাংস
6. পেস্ট্রি 7. কুকিজ
8. কোল্ড ড্রিংকস
9. গুড় বা চিনি

জনের খাদ্যাভ্যাস

1. রুটি 2. মাংস 3. ফ্রাই
4. আইসক্রিম 5. রোস্ট
6. কেক ও ডিম
7. চিনি 8. বার্গার
9. হালকা পানীয়
10. ফ্রুট জুস

টিটু এবং জনের ওজন স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি। বয়স ও উচ্চতার তুলনায় একজন ব্যক্তির যে ওজন হওয়া উচিত তার **20%** বেশি হলে যে ওই ব্যক্তিকে স্থূল বা মোটা বলে ধরা হয়।

টিটু ও জনের স্থূলত্বের কারণগুলো কী কী?

টিটু ও জন প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লিপিড/শর্করা/ প্রোটিন বেশি গ্রহণ করে।

টিটু ও জন পরিশ্রমের তুলনায় কম/বেশি খাদ্যগ্রহণ করে।

টিটু ও জনের এই ওজন বেড়ে যাওয়ায় ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

- রক্তচাপ ক্রমাগত বাড়তে পারে।
- রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস হতে পারে।
- রক্তনালীর গায়ে লিপিড জমে রক্তনালীর ব্যাস কমে যেতে পারে। এর ফলে হৃৎপিণ্ডের নানা সমস্যা হতে পারে।
- অস্থিসন্ধিতে ব্যথা ও ক্যানসার হতে পারে।

এছাড়াও স্থূলত্বের ফলে আর কী কী সমস্যা হতে পারে তা নিজেরা আলোচনা করে তালিকা তৈরি করো।

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

কোন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করলে স্থূলত্বের প্রবণতা রোধ করা যায় তার তালিকা তৈরি করো (টিক দাও)।

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

শব্দভাণ্ডার : সিদ্ধ, তেলমশলাহীন, হালকা পানীয়, আলুভাজা, তেলযুক্ত মাছ, ডিমের কুসুম, চকোলেট, ঘি, মাখন, ফল, সবজি, ডাল, রুটি, পাঁঠার মাংস, পেস্ট্রি, বার্গার, ছোটো মাছ, তন্তুযুক্ত খাদ্য, কাবাব।

এবার নীচে বিভিন্ন শিশুর বা ব্যক্তির ওজন ও উচ্চতা দেওয়া হলো। এর ভিত্তিতে BMI এর মান গণনা করো। তারপর শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে বলার চেষ্টা করো কোন কোন ক্ষেত্রে স্থূলত্বজনিত সমস্যার সম্ভাবনা হতে পারে।

BMI 18.5 – 25 : স্বাভাবিক ওজন; BMI 25 – 30 : বেশি ওজন; BMI 30 – 40 : স্থূলত্ব

ওজন (kg)	উচ্চতা (m)	BMI (ওজন/উচ্চতা^{2})	স্থূলত্বের সম্ভাবনা (আছে/নেই)	কী কী উপসর্গ দেখা যায়
62	1.57			
66	1.50			
72	1.59			
38	1.62			
75	1.60			
71	1.58			
72	1.67			

প্রাকৃতিক খাদ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, সংশ্লেষিত খাদ্য

গাছের খাবার, ঘরে তৈরি খাবার আর কারখানায় তৈরি খাবার

আমরা অনেকেই গাছের পাকা ফল খেতে ভালোবাসি আবার অনেকেই পপকর্ন, কোল্ড ড্রিঙ্কস, পট্যাটো চিপস খেতে ভালোবাসেন।

এক-একজনের এক-একরকম খাবার খেতে ভালো লাগে। জানো কি, ওইসব চিপস আর ড্রিঙ্কস কী কী দিয়ে তৈরি হয়? চলো দেখি।

জোগাড় করো একটা আম (নইলে অন্য যে-কোনো ফল), জ্যাম বা জেলির একটা বোতল (খালি নয়তো ভরতি, তোমার যেমন ইচ্ছে), আর জোগাড় করো কমলালেবুর গন্ধওয়ালা কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কসের একটা বোতল (দুটো বোতলেরই লেবেলটা যেন ঠিক থাকে)।

আগে দেখে নিই, কোনটা কোথা থেকে পেলে। দরকারে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।

	কোথা থেকে পেলে
আম (বা অন্য ফল)	
জ্যাম বা জেলি	
কোল্ড ড্রিঙ্কস	

- ফলটা যেমনটি গাছে ফলে, তেমনটিই তুমি খাও। আর কী কী তুমি খাও এমন চার-পাঁচটি খাবারের নাম লেখো তো।
- তুমি রোজ দুপুরে বা রাতে যা যা খাও, তা যেমনটি গাছে ফলে তেমনটি খাও না। সেই খাবারগুলো কী ভাবে বানানো হয়? সেইরকম কয়েকটি খাবারের নাম লেখো।
- জ্যাম আর কোল্ডড্রিঙ্কস? এসো ভালো করে দেখি।

	ফল	জ্যাম, জেলি, আচার	ঠান্ডা পানীয়
আকার, স্বাদ, গন্ধ আর রং গাছে যেমনটি ফলে, তেমনটিই কি থাকে?			
কী কী দিয়ে তৈরি হয়? (বোতলের গায়ে লেখা আছে দেখো)			
কোথায় তৈরি হয়? (এটাও বোতলের গায়ে লেখা আছে দেখো)			

তোমরা প্রতিদিন নানাধরনের খাদ্য খাও। এবার তোমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

খাবারের আকৃতি, স্বাদ, গন্ধ ও রং	প্রতিদিনের খাবার	এর মধ্যে কী জিনিস আছে	এরকম আরো কয়েকটি খাবারের নাম
প্রাকৃতিক			
সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক থেকে একটু আলাদা			
স্বাভাবিক থেকে একদম আলাদা			

তাহলে দেখো :

প্রাকৃতিক খাবারের পুষ্টিগুণ সবচেয়ে বেশি, দাম তুলনায় কম। প্রক্রিয়াজাত খাবারের পুষ্টিগুণ তুলনায় কম, দাম কিছু বেশি। আর কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত খাবারের পুষ্টিগুণ প্রায় নেই, অথচ দাম অনেক বেশি। তা বলে কি এই সব খাবার সবটাই ভালো?

প্রাকৃতিক খাদ্য : সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া খাবার।
প্রক্রিয়াজাত খাদ্য : এই ধরনের খাবার তৈরি করতে প্রকৃতি থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্য উপাদানদের নানা রকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
সংশ্লেষিত খাদ্য : এই ধরনের খাবারের উপাদানগুলো সম্পূর্ণ কৃত্রিম। কিন্তু তৈরি খাবারটার রং, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি অনেকটাই প্রাকৃতিক খাবারের মতো হয়।

এসো দেখি নীচের খাবারগুলোতে নানা ধরনের ক্ষতিকারক পদার্থ (কৃত্রিম রং, গন্ধ ও স্বাদ) মেশানো হয় যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়।

খাদ্য	কী কী মিশে থাকতে পারে
হলুদ মিষ্টি ও সস্তা বিরিয়ানিতে	মেটানিল ইয়েলো
চকোলেট, পেস্ট্রি আর কোলা ড্রিঙ্কস	বাদামি রং হিসেবে ক্যারামেল
পট্যাটো চিপস, ভুট্টার খই	ট্রান্স ফ্যাট
মোমো, চাউমিন	আজিনোমোটো
আইসক্রিম	কারাজিনান, ব্রোমিনেটেড ভেজিটেবল অয়েল
চা, কফি আর নানা ফলের স্বাদের রসে	সাইক্লামেট, অ্যাস্পার্টেম, স্যাকারিন

এছাড়া আরও কত রয়েছে। এইসব প্রক্রিয়াজাত আর কৃত্রিম খাবার খেলে যত ইচ্ছে তত খাওয়া ঠিক নয়। এগুলো বেশি খেলে আমাদের নানারকম শারীরিক অসুবিধা বা হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ,বৃক্ক, হাড় ও মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে। শরীর ভালো রাখতে হলে হলুদ, গোলাপি বা উজ্জ্বল লাল রং-মেশানো খাবার না খাওয়াই ভালো। এধরনের খাবার আমাদের না খেলেও চলে।

এসো নিজেরা একটা ছক বানাই, কোন খাবার আমরা কতটা (কম না বেশি) খাব:

রোজ সকালে কী কী খেতে পারি?	
রোজ দুপুরে কী কী খেতে পারি?	
রোজ বিকেলে কী কী খেতে পারি?	
রোজ রাত্রে কী কী খেতে পারি?	
বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে কী কী খেতে পারি?	
রোগ এড়িয়ে চলতে গেলে কোন কোন খাবার না খাওয়াই উচিত?	

ভাত, মুড়ি, চিঁড়ে, লুচি, দই, ঘোল, ছানা, পনির, এগরোল, আলুর চপ - এগুলোর কোনগুলো প্রাকৃতিক, প্রক্রিয়াজাত বা কৃত্রিম তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

নীচের ছবিগুলো থেকে প্রাকৃতিক, প্রক্রিয়াজাত ও সংশ্লেষিত খাদ্যগুলো শনাক্ত করো ।

জীবনে জলের ভূমিকা

জল দিয়ে আমরা কী করি বলো তো? জল অন্যান্য জীবেরও বা কি কাজে লাগে?

ওপরের ছবিগুলো থেকে মানুষ ও বিভিন্ন জীবের জীবনে জলের ভূমিকাগুলো লিখে ফেলো।

1.	5.	9.
2.	6.	
3.	7.	
4.	8.	

পৃথিবীতে এত জল কোথায় কোথায় থাকে ?

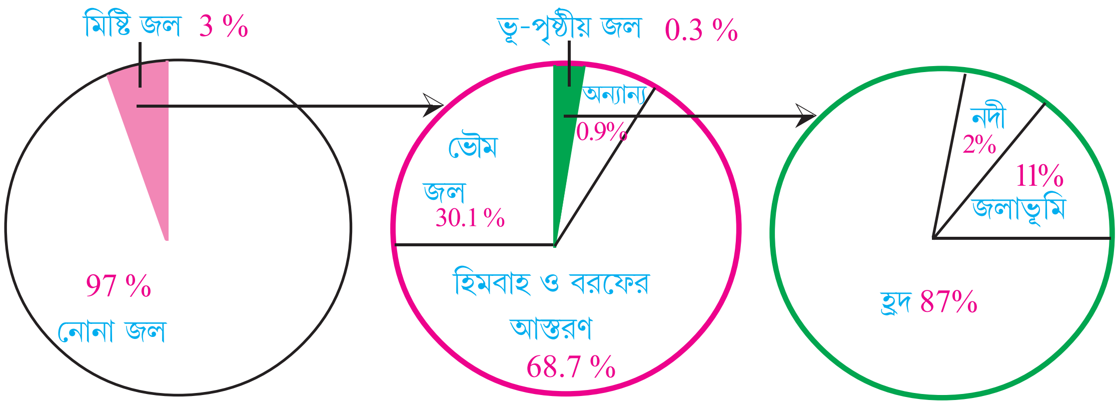

মোট জল

মিষ্টি জল কোথায় কত

ভূ-পৃষ্ঠীয় জল কোথায় কত

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে কোনটার শতকরা পরিমাণ কত বলো । (না জানলে শিক্ষক /শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

সমুদ্রের জল .... মিষ্টি জল .... পানীয় জল .... ।

আমরা খাবার জল কোথা কোথা থেকে পাই ?

1........... 2........... 3........... 4........... 5........... 6...........

বলো তো, কুয়ো ও টিউবওয়েলের জল আসে কোথা থেকে? ছবিটা দেখে ভেবে বলো। (না পারলে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

এসো জলের পরিমাণ সংক্রান্ত কতকগুলো বিষয় জানি।

পৃথিবীর মিষ্টি জলের হিসেবনিকেশ ঃ

- পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় 75% জলে ঢাকা। এর প্রায় 97% সমুদ্রের জল। প্রায় 3% মিষ্টি জল।
- এই মিষ্টি জলের প্রায় $\frac{2}{3}$ অংশ মেরু অঞ্চল, পর্বতশীর্ষের বরফ ও হিমবাহের অংশ হিসেবে সঞ্চিত আছে। বাকি জল মাটির নীচে ও অন্যান্য জায়গায় নানারূপে সঞ্চিত আছে।
- যদিও পৃথিবীর প্রায় $\frac{3}{4}$ ভাগ জলে ঢাকা, কিন্তু এই জলের 0.37% অংশ জলই পান করার উপযোগী।

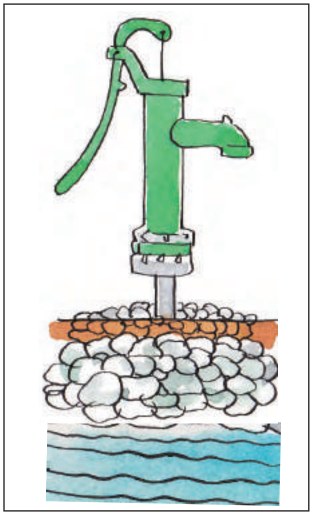

তোমরা বন্ধুরা কতজন কোন কোন উৎস থেকে জল ব্যবহার করো, ওই জলের রং, গন্ধ আর স্বাদ কেমন, আর কী কী কাজে তা ব্যবহার করো লেখো।

উৎস	রং	গন্ধ	স্বাদ	কতজন ব্যবহার করো	কী কাজে ব্যবহার করো
পুকুর					
নদী					
ঝরনা					
কুয়ো					
টিউবওয়েল					
টাইমকল					
নিজেদের পাম্প					

গত কয়েক মাসে তোমাদের কার কী পেটের রোগ আর চামড়ার রোগ হয়েছে সবাই আলোচনা করে লেখো :

রোগ	কজনের হয়েছে	তারা কোন উৎসের জল খায়
পেট খারাপ		
পেট ব্যথা		
কৃমি		
জন্ডিস		
পাঁচড়া		

দূষিত জল থেকে নানা রোগ হতে পারে। জলকে পরিষ্কার করব কীভাবে?

এসো সকলে মিলে আলোচনা করে দেখি, নীচের জিনিসগুলো ব্যবহার করে কীভাবে জলকে পরিষ্কার করা যায়। তুমি এই কাজে ছবিতে দেওয়া জিনিসগুলো থেকে এক বা একাধিক উপকরণ একেকবারে ব্যবহার করতে পারো। এই উপকরণগুলো ব্যবহার করে কতরকমভাবে জলকে পরিষ্কার করা যায়?

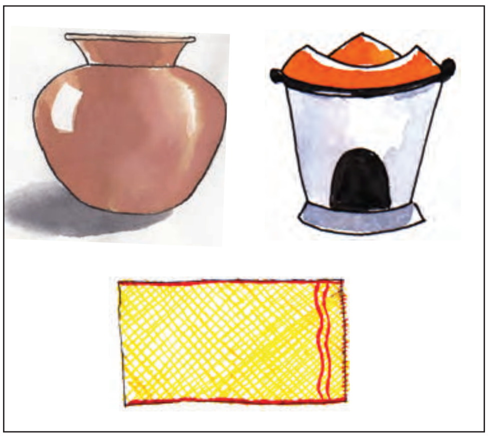

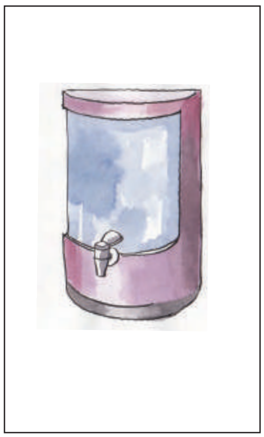

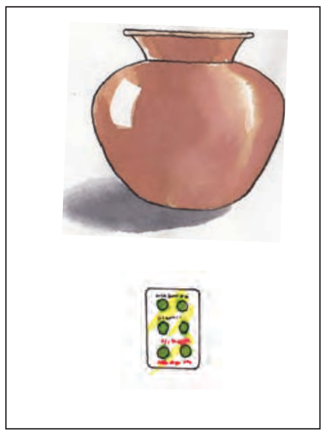

কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যায়	কীভাবে বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল তৈরি করা যায়
হাঁড়ি, উনুন, কাপড়	জলের উৎস থেকে পাওয়া জল অন্তত 20 মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে।
ফিল্টার যন্ত্র	
হাঁড়ি, হ্যালোজেন ট্যাবলেট	খুব তাড়াতাড়ি জলকে জীবাণুমুক্ত করতে হলে হ্যালোজেন ট্যাবলেট দিয়ে জল শোধন করা হয়।

সাগর-মহাসাগর পৃথিবীর ওপরকার প্রায় 3/4 অংশ দখল করে আছে। তেমনি মানুষের শরীরের ওজনের প্রায় 70% শুধু জল। গাছের শরীরে জন্তুজানোয়ারের তুলনায় জলের ভাগ বেশি। ওজন হিসেবে জেলিফিসে জলের পরিমাণ 95%, ডিমে 74%। আবার শশাতে ওজন হিসেবে জলের পরিমাণ 95%। কাঠের মধ্যে জলের পরিমাণ প্রায় 10%। এবার এসো দেখি মানুষের শরীরে কোন কোন পদার্থ তরলরূপে থাকে।

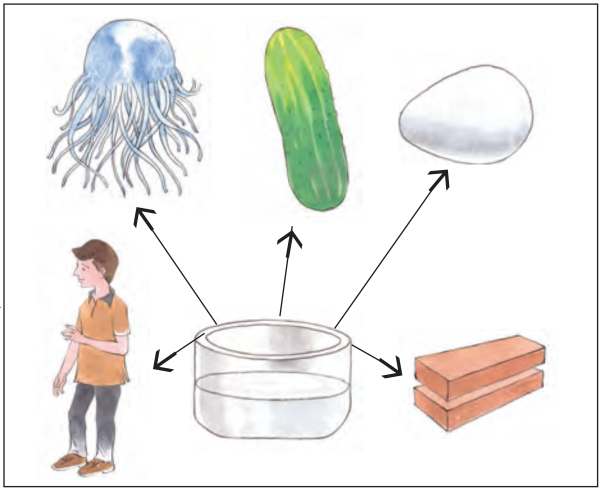

প্রথমে লেখো তোমার দেহে জল কোথায় কোথায় থাকে?

1.রক্ত 2. .... 3. ....
4. .... 5. .... 6. ....

তারপর লেখো তোমার দেহ থেকে জল কীভাবে বেরিয়ে যায়?

1. ঘাম 2. .... 3. .... 4. ....

আবার মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে ও তরল পদার্থে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে।

অঙ্গের / তরল পদার্থের নাম	ওজন হিসেবে জলের পরিমাণ (%)
ফুসফুস	83
মস্তিষ্ক (মগজ)	73
যকৃৎ (মেটে)	85
অস্থি (হাড়)	31
পেশি (মাংস)	75
ত্বক (চামড়া)	64
হৃৎপিন্ড	73
বৃক্ক	83
রক্ত	90
লালা	95

আগের পাতার ছক থেকে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ/তরলকে জলের পরিমাণের অধঃক্রম অনুসারে সাজাও:

1. .... 2. .... 3. .... 4............................ 5............................

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে জল কীভাবে অবস্থান করে তা নীচে দেওয়া আছে। কোন অঙ্গে তা কীভাবে আছে, তা নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নীচের ছকে লেখার চেষ্টা করো :

অঙ্গের নাম	জল কী হিসাবে থাকে
(1) মুখবিবর	
(2) যকৃৎ	
(3) রক্তনালী/হৃৎপিণ্ড	
(4) মূত্রথলি	
(5) চোখ	
(6) ত্বক	
(7) মস্তিষ্ক	
(8) অস্থিসন্ধি	

শব্দভাণ্ডার : পিচ্ছিল রস, ঘাম, অশ্রু, রক্ত, পিত্ত, লালা, মূত্র, সেরিব্রোস্পাইনাল তরল।

এবার একটা একটা করে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করো। না পারলে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও। আর সবচেয়ে নীচে জলের কাজগুলো একটা একটা করে লেখো।

1. তোমার পা কেটে গেছে। ডাক্তারবাবু তোমার হাতে ওষুধ ইনজেকশন দিলেন। ওই ওষুধ তোমার কাটা ঘা-এ পৌঁছোবে কীসের মধ্যে দিয়ে? ....।
   তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।
2. একটা বড়ো বিস্কুট একবারে চিবিয়ে ফেলো। তোমার মুখের ভেতরটা এখন কেমন, শুকনো না ভিজে? ....। দেখত, গিলতে পারছ কি? কথা বলতে চেষ্টা করত। কথা বলা যাচ্ছে কি? .... । যদি মুখের ভেতরটা শুকনো লাগে তাহলে তুমি কী করবে?
   তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।
3. খুব গরমে আমরা ঘামি। ঘাম জড়ানো গায়ে বাতাস দিলে কেমন লাগে? ....।
   তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।
4. তোমার চোখে কোন তরল থাকে? ....।
   চোখে পোকা পড়লে চোখ থেকে কী বেরোয়? ....।
   কেন বেরোয়? ....।
   তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।

5. তোমার নিশ্বাস একটা আয়নায় ফেলে দেখো, আয়নায় কীসের দাগ পড়ছে? ....।
নিশ্বাসের মধ্যে এই জল কোথা থেকে এল? .... । তাহলে জলের কী কাজ আছে? ....।
এখানে জলের আর কী কাজ আছে? ....।

6. তোমার দুটো হাড়ের জোড়ে থাকা পিচ্ছিল রসে জল আছে সেটা জেনেছ। ওই জল কী কাজ করে?
...............................।

7. পেট খারাপ হলে বারবার তরল মল বেরিয়ে যায় বা বমি হয়। তখন অনেক দরকারি জিনিস জলে গুলে বেরিয়ে যায়। জল এখানে কী কাজ করে বলো তো? ....।

8. খাদ্যগ্রহণের পর মুখবিবরে খাদ্য হজম করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।

9. পাচনের পর খাদ্যের সারাংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর বরাবর শোষিত হয়। তাহলে জলের এখানে কী কাজ আছে? ....।

10. খাদ্যের যে অংশ হজম হয় না তা নরম মলরূপে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাহলে এখানে জল কী ভূমিকা পালন করে? ....।

11. ম্যালেরিয়া বা নিউমোনিয়ার মতো রোগে প্রবল জ্বর আসে। ঘাম দিয়ে জর ছাড়ার সময় বা প্রবল জ্বরে স্নান করানোর সময় জল কী কাজ করে? ....।

12. খাদ্য সংশ্লেষের সময় জল ব্যবহৃত হয়। এখানে জল কী কাজ করে? ....।

জলের ভূমিকা : জল সাধারণত কোনো বস্তুকে দ্রবীভূত করে, কোনো বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় বা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

এবার ওপরের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে জলের ভূমিকাগুলো শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

ঘটনাসমূহ	জলের ভূমিকা
1.	
2.	
3. ঘাম জড়ানো গায়ে বাতাস দিলে আরাম লাগে	তাপ পরিবাহক হিসেবে
4.	
5.	
6.	
7. পেট খারাপ হলে অনেক দরকারি জিনিস মল বা বমির সঙ্গে বেরিয়ে যায়	দ্রাবক হিসেবে
8.	
9.	
10.	
11.	
12. খাদ্য হজমের সময় জল ব্যবহৃত হয়	বিক্রিয়ক হিসেবে

শরীর সুস্থ রাখতে প্রতিদিন পরিমাণমতো জল খাওয়া দরকার। গরমকালে তুমি রোজ কতটা জল খাও ? তোমার বন্ধুরাই বা কতটা খায় ? সবাই মিলে একসঙ্গে নীচের ছকে লেখো :

জলের উৎস	তুমি	তোমার বন্ধু	তোমার বন্ধু	তোমার বন্ধু	তোমার বন্ধু
খাবার জল					
চা, দুধ বা অন্য পানীয়					
ডাল, ঝোল					
ফলের রস					
অন্যান্য					

- কয়েকটা কথা মনে রেখো।
- ভাত বা তরকারির মধ্যেও কিন্তু 40-60 % জল থাকে ।
- একটা বড়ো গ্লাসে প্রায় 200 মিলি জল ধরে ; আর একটা বড়ো কাপে প্রায় 100 মিলি জল ধরে। সাধারণ হাতায় জল থাকে প্রায় 50 মিলি।
- জলের বোতলে জল ধরে : ছোটো - 500 মিলি, মাঝারি - 1 লিটার আর বড়ো - 2 লিটার।

24 ঘন্টায় কতটা জল পান করো ?

তুমি ....

তোমার বন্ধুরা : 1. .... 2............... 3. .... 4...................

তাহলে গরমকালে তুমি আর তোমার বন্ধুরা এক-একজনে রোজ জল খাও কতটা ?

আর ওইসময়ে তুমি বা তোমার বন্ধুরা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখো, তোমাদের দেহ থেকে গড়ে কতটা জল বের হয়ে যায়।

1. মূত্রের মাধ্যমে	1.5 - 2 লি
2. ঘামের মাধ্যমে	2 লি
3. শ্বাসের মাধ্যমে	400 মিলি
4. মলের মাধ্যমে	200 মিলি
5. চোখের জলের মাধ্যমে	50 মিলি

মোট কত পরিমাণ জল সারাদিনে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় ? ....।

ঠিক কত পরিমাণ জল পান করা প্রয়োজন ?

একজন সুস্থ ব্যক্তি যদি প্রতিদিন তার দেহের ওজনের কেজি প্রতি 50 মিলিলিটার জল পান করেন তবে তার দেহের দৈনিক জলের চাহিদা পূরণ হয়।

নীচের তালিকায় বিভিন্ন শিশু/প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহের ওজনের দেওয়া হলো। তাদের জলের চাহিদা হিসেব কষে বার করো:

দেহের ওজন (কেজি)	দৈনিক জলের চাহিদা (লি)	দৈনিক কত গ্লাস জল পান করা প্রয়োজন (এক গ্লাসে প্রায় 200 মিলি জল ধরে)
1. 20		
2. 30		
3. 40		
4. 50		
5. 70		

এবার বলো তো, তোমার দেহ রোজ যতটা জল হারায় তুমি ততটা জল কি পান করো? ....।
না হলে কী হতে পারে? ....।

এতক্ষণ তোমরা দেখলে জল মানুষের দেহে নানা ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য জীবদের বেঁচে থাকার জন্যও জল একইভাবে জরুরি। এই ভূমিকার জন্য জলের নানা ধর্ম কাজ করে। এবার বুঝে নাও কোন ধর্ম জলকে জীবদেহে কোন ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করে।

জলের ধর্ম	জীবদেহে জলের ভূমিকা
1. ঘরের তাপমাত্রায় তরল।	জীবের প্রয়োজনীয় নানা বিক্রিয়া ঘটাতে ও জীবের বেঁচে থাকার তরল মাধ্যম রূপে কাজ করে।
2. জলকে গরম করতে প্রচুর তাপের প্রয়োজন।	বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রা দ্রুত বদলালেও বড়ো চেহারার প্রাণীদের দেহের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকে।
3. জলকে বাষ্প করতে প্রচুর তাপের প্রয়োজন।	ঘাম হওয়া ও বাষ্পমোচনের মাধ্যমে জল বেরিয়ে গেলে দেহ ঠান্ডা হয়। খুব অল্প পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হলেও অনেক পরিমাণ তাপ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।
4. অন্য যে-কোনো তরলের তুলনায় জলে বিভিন্ন বস্তু সহজেই গুলে যায়।	সহজেই বিভিন্ন বস্তুকে দেহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।
5. জলের কোনো রং নেই।	জলের গভীরে থাকা উদ্ভিদও খাদ্য তৈরির জন্য আলো পেতে পারে।

খাদ্য তৈরিতে জল ও আলোর ভূমিকা

1. (a) একটা টবের গাছকে বেশ কয়েকদিন ধরে সূর্যের আলোতে, জল না দিয়ে, রেখে দিলে কী হবে? ....।

(b) কেন এমন হলো? ....।

(c) ওই কয়েকদিন গাছটা যদি সূর্যের আলো না পেত তাহলে কী হতো?
....।

2. (a) ঐ টবের গাছটাকে যেখানে কোনো আলোই পৌঁছোয় না, এমন অন্ধকার ঘরে বেশ কয়েকদিন (10-15 দিন) রেখে দেওয়া হলো। কয়েকদিন পরে টবের গাছটার কী অবস্থা হতে পারে বলে তোমার মনে হয়? ....।

(b) এমন হওয়ার পেছনে কারণ কী? ....।

3. কয়েকদিন গাছটাকে অন্ধকার ঘরে রেখে নিয়মিত জল দেওয়া হলো। তাহলে কি গাছটার পরিণতি অন্যরকম কিছু হবে?

4. টবের গাছটাকে জল দিয়ে পর্যাপ্ত সূর্যালোকে রেখে দেওয়া হলো। তুমি কী দেখতে পাবে?

ওপরের চারটে ঘটনা দেখে কী বোঝা গেল বলো তো? গাছের তাহলে বেঁচে থাকার জন্য জল আর আলো দুটোই প্রয়োজন।

কিন্তু গাছের জল আর আলো কেন প্রয়োজন বলতে পারবে কি?

....।

আচ্ছা গাছ থেকে তো আমরা নানারকম খাবার পাই। তাহলে গাছ খাবার পায় কীভাবে বলো তো?

....।

দেখো তো তোমরা বলতে পারো কিনা? বাড়িতে আর গাছে কীভাবে খাবার তৈরি হয় নীচের ছকটায় লিখতে চেষ্টা করো ।

বাড়িতে	গাছে
1. খাবার তৈরি হয় কোথায়?	1. খাবার তৈরি হয় কোথায়? ....
2. রান্না করতে কী কী লাগে?	2. খাবার তৈরি করতে কী কী লাগে?
চাল	(i) ....
....	(ii) সবুজ গাছের ক্লোরোফিল কণা
....	(iii) ....
....	(iv) কার্বন ডাইঅক্সাইড
3. রান্নার পর কী কী খাবার তৈরি হয়?	3. খাবার তৈরির সময় কী কী পাওয়া যায়?
(i) ভাত	(i) শর্করা জাতীয় খাবার (গ্লুকোজ)
(ii)	(ii) অক্সিজেন
(iii)	(iii) জল

উদ্ভিদের খাবার তৈরি আর জল :

এসো প্রথমেই জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি গাছ কোথা থেকে জল পায় ঃ

স্থলজ উদ্ভিদ জল পায় .... ।

জলজ উদ্ভিদ জল পায় .... ।

কিন্তু এই জলটাকে গাছ কীভাবে নিজেদের শরীরে নেয়? এই জল, গাছ নিশ্চয়ই কোনোভাবে নিজেদের দেহে শুষে নেয়। কীভাবে জানো কি?

মাটির নীচেথাকা কোন অংশটা দিয়ে গাছ জল টানে? .... ।

ওই অঙ্গটা কি কোনোভাবে মাটি থেকে জল শুষে নিতে সাহায্য করে .... ।

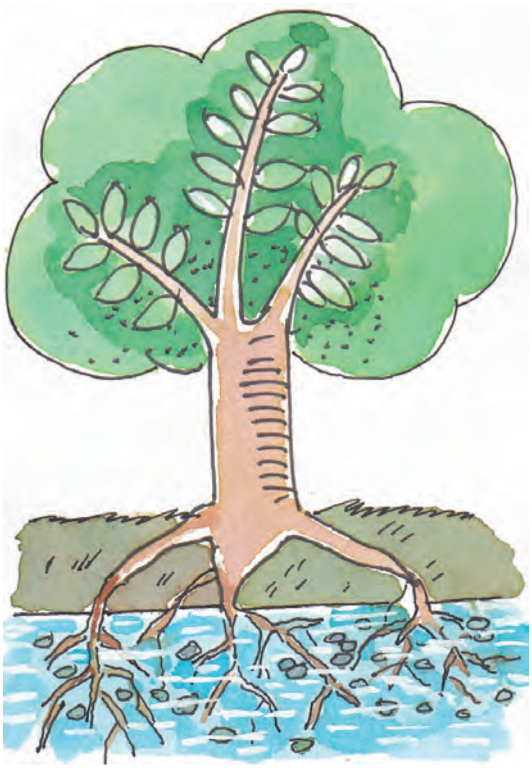

স্থলজ উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে মাটির কণার গায়ে লেগে থাকা জল শুষে নেয়। কোনো কোনো স্থলজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে মূল দিয়ে জলীয় বাষ্প শুষে নেয়। আর জলজ উদ্ভিদ তার জলে ডুবে থাকা সমস্ত অংশ দিয়ে জল শোষণ করে।

আর আলো? গাছেরা সেটা কোথা থেকে পায় নিশ্চয় তোমাদের আলাদা করে বলে দিতে হবে না। লিখে ফেলো দেখি .... ।

উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে জলের ভূমিকা :

মূল বা দেহের অন্যান্য অংশ দিয়ে শোষণ করা জল গাছ পাতায় পৌঁছে দেয়। গাছের খাবার তৈরি হয় এই পাতায় বা অন্যান্য সবুজ অংশ তাই .... হলো গাছের রান্নাঘর।

গাছের খাবার তৈরির প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় অক্সিজেন গ্যাস। জানো কি এই অক্সিজেন কোথা থেকে পাওয়া যায়? খাবার তৈরির সময় এই জল ভেঙেই অক্সিজেন পাওয়া যায়।

উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে আলোর ভূমিকা :

গাছের খাবার তৈরি করার প্রক্রিয়াটার নাম জানো কি? গাছের খাবার তৈরি করার প্রক্রিয়াটার নাম হলো সালোকসংশ্লেষ। এসো তো এই শব্দটাকে ভেঙে দেখি শব্দটার মানে কী। সালোকসংশ্লেষ শব্দটাকে ভাঙলে পাই, সালোক আর সংশ্লেষ। আর সালোক শব্দটাকে ভেঙে কী পাই? স + আলোক।

তাহলে কী বোঝা গেল? স + আলোক মানে আলোর উপস্থিতি আর সংশ্লেষ মানে হলো তৈরি করা। অর্থাৎ আলোর উপস্থিতিতে কোনো একটা কিছু তৈরি করা হচ্ছে। এই আলো হলো সূর্যের আলো।

সূর্যের আলোর শক্তির খুব সামান্য একটা অংশ গাছ শোষণ করে। সূর্যের এই শক্তি আর গাছের সবুজ কণা - ক্লোরোফিল, এদের সাহায্যেই গাছ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটা শুরু করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার পরের ধাপগুলোতে প্রয়োজন হয় জল আর পরিবেশ থেকে নেওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের।

সূর্যের আলো থেকে যে শক্তি গাছ শোষণ করে, তার একটা অংশকে গাছ রূপান্তরিত করে তার তৈরি করা শর্করা জাতীয় খাবারে জমা করে রাখে।

মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণীরা যখন উদ্ভিদজাত কোনো খাবার খায়, তারা আসলে খাবারে জমিয়ে রাখা সূর্যের ওই রূপান্তরিত শক্তিটাকেই ব্যবহার করে। সূর্যের ওই রূপান্তরিত শক্তিটাকে ব্যবহার করেই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা তাদের নানা কাজের শক্তির চাহিদা পূরণ করে।

উদ্ভিদের দেহের গঠনগত বৈচিত্র্য

মূল

মূল আর আমাদের পরিচিত খাবার

নীচের ছবিটা ভালো করে দেখো। তোমরা রোজ যেসব খাবার খাও তার কিছু কিছু নীচে দেওয়া আছে। খুঁজে বার করে লেখো, তার কোনটা গাছের কোন অংশ (অংশগুলোর নাম নীচে দেওয়া আছে)।

মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ

এবার তুমি আজ আর গতকাল যেসব খাবার খেয়েছ তা নীচের তালিকায় সাজিয়ে লেখো, তারপর সেই খাবারগলোর কোনটি গাছের কোন অংশ থেকে পাওয়া যায়, তা লেখো।

ক্রমিক সংখ্যা	খাবারের নাম	গাছের কোন অংশ থেকে তৈরি হয়
	ভাত	
	রুটি	
	ডাল	বীজ

এবার তুমি গত দু-দিনে গাছের মূলজাতীয় কোন কোন উদ্ভিজ্জ খাবার খেয়েছ তার নাম লেখো : ------, ------, ------।

ভেবে দেখো তো মাটির নীচ থেকে গাছের যা যা অংশ তুমি খাও, তার সবটাই কী মূল? নীচের তালিকায় লেখো।

ক্রমিক সংখ্যা	খাবার	মূল/ কাণ্ড
	গাজর	
	বীট	
	আলু	
	আদা	
	মুলো	

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের দলে ভাগ করে প্রতিটি দলকে একটি করে মুলো/গাজর/বীট/মাটির নীচের অংশ সমেত থানকুনি বা কোনো ঘাস আর একটি করে জবা গাছের ডাল/বাঁশের কঞ্চি/পুঁইশাক আনতে বলবেন।

সারণিতে দেওয়া বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তোমার আনা সবজিগুলোর তুলনা করে দেখো। কী জানতে পারলে?

বৈশিষ্ট্য	মুলো/গাজর/বীট/মাটির নীচের অংশ সমেত থানকুনি বা কোনো ঘাস	জবা গাছের ডাল/ বাঁশের কঞ্চি/পুঁইশাক
মাটির ওপর বা নীচ থেকে পাই		
সরু রোঁয়ার মতো গঠন পাশ থেকে বেরিয়েছে কিনা		
সাধারণত খানিক দূরে দূরে পাতা আর শাখা প্রশাখা দেখা যাচ্ছে কিনা		
খাড়াভাবে আছে নাকি লতিয়ে আছে		
সবুজ বা অন্য কোনো রঙের নাকি বর্ণহীন		
কোনো সামান্য ফোলা অংশ আছে কিনা যেখান থেকে শাখা বা পাতা বেরিয়েছে		

এবার তাহলে এসো দেখি মূল চেনার উপায় কী?

- বীজের নীচের অংশ থেকে বের হয় এবং মাটির মধ্যে প্রবেশ করে।
- কোনো গাঁট বা নোড (Node) নেই।
- নীচের দিকে ডগায় একটা টুপি আর কিছুটা ওপরের দিকে রোঁয়া রোঁয়া থাকে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি দলকে একটি করে ডাঁটাশাক/নটেশাক/পুঁইশাকের মূল, যে-কোনো জংলা গাছের মূল এবং তুলসী /আকন্দ/ কালমেঘ/ বাসক/ কুলেখাড়া/ঘৃতকুমারী ইত্যাদি গাছের মূল আনতে বলবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা কোনো একটি মূল, অঙ্কুরিত ছোলা, আম বা তেঁতুল বীজ সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

তোমাদের আনা নমুনা মূলগুলি সম্পর্কে এসো ভালো করে জানা যাক।

1. মূলটি মাটির উপরে ছিল, না মাটির নীচে ছিল?
2. অঙ্কুরিত বীজটির সঙ্গে তুলনা করে বলো, বীজের কোন অংশটি থেকে মূল তৈরি হয়েছে?
3. দেখো তো মূলে নীচের বিষয়গুলো আছে কিনা?

(ক) মূলের একেবারে ডগায় টুপি আছে কিনা।

(খ) টুপির ঠিক ওপরে কোনো রোঁয়া ছাড়া কিছুটা নরম অংশ আছে কিনা।

(গ) রোঁয়া ছাড়া অংশের পর রোঁয়া হওয়া অংশ আছে কিনা।

(ঘ) রোঁয়া হওয়া অংশের ওপর কোনো শক্ত অংশ আছে কিনা। গাছকে মাটি থেকে তোলার সময় তার শেকড় বা মূল কিছুটা ছিঁড়ে যায়। সেক্ষেত্রে তোমরা হয়তো মূলের ডগায় টুপি বা তার ওপরের রোঁয়াগুলো দেখতে পাবে না। তাই তোমরা যদি কচুরিপানাকে জল থেকে তুলে তার শেকড়গুলোকে দেখো তাহলে ওই মূলের ডগায় টুপিটা দেখতে পাবে।

এবার আমরা জেনে নিই মূলের এই বিভিন্ন অংশগুলোর নাম কী আর সেগুলো থাকলে গাছের লাভই বা কী।

- মূলের ডগার টুপির মতো অংশটা হলো মূলত্র (Root Cap)। এই অংশ, মাটিতে মূল ঢোকার সময় শক্ত আঘাত থেকে মূলের নরম অংশকে বাঁচিয়ে রাখে। আর মূলের এই জায়গাটাই হলো মূলত্র অঞ্চল (Root cap zone)।
- মূলের টুপির ঠিক ওপরের জায়গা যেখানে কোনো রোঁয়া নেই এই জায়গাটাতেই মূল লম্বায় বাড়তে থাকে। আর মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। এই জায়গাটাকে বলে মূলের বেড়ে ওঠার জায়গা বা বর্ধনশীল অঞ্চল (Growth zone)।
- মূলের এই বেড়ে ওঠার জায়গাটার ঠিক ওপরেই রোঁয়া রোঁয়া যে জায়গাটা, সেটা হলো মূলরোম অঞ্চল (Root hair zone)। এই রোমগুলো দিয়ে গাছ মাটি থেকে জল ও নানারকম খনিজ পদার্থ শোষণ করে।
- মূলের এই রোঁয়া রোঁয়া জায়গাটার ওপরে যে শক্ত অংশের জায়গাটা সেটা হলো স্থায়ী অঞ্চল (Permanent zone)। মাটির সঙ্গে গাছকে শক্ত করে আটকে রাখা এই অঞ্চলের কাজ।

4. তোমার আনা মূলটা মাটির কত গভীর পর্যন্ত ঢুকেছিল? (স্কেল দিয়ে মেপে ফেলো)

মূলের কাজ ঃ

1. a. গাছটা কোন অংশ দিয়ে মাটি আঁকড়ে ছিল?
   b. এর থেকে মূলটি কী কাজ করে বলে তুমি বুঝলে?
2. a. মূলটা তোলার সময় শুকনো না ভিজে ছিল?
   b. গাছের গোড়ার মাটিতে জল ঢাললে সেটা কোথায় কোথায় যেতে পারে?
   c. টবের গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছটির কী কী পরিবর্তন হয়?
   d. এর কারণ কী?
   e. এর থেকে মূলের আর কী কাজ আছে বলে তোমার মনে হয়?

মূলের প্রধান কাজ ঃ দৃঢ়তা প্রদান/গাছকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে রাখা ও মাটি থেকে জল শোষণ করা।

এসো দেখা যাক মূলের আর কী কী কাজ আছে?

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি দলকে একটি করে ঘাস বা ধানের মূলসহ গাছ এবং যেখানে যেমন পাওয়া যাবে তেমন পরগাছা, পাথরকুচির মূলসহ পাতা, বটের ঝুরি, তাল গাছের কাঁটা আর সুন্দরী গরান ইত্যাদি গাছের মূল আনতে বলবেন।

তোমার আনা ঘাস বা ধানের মূলটাকে ভালো করে দেখো। আগের দিন যে মূলটা দেখেছিলে, এটা কী তারই মতো? এসো দেখি। নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

বৈশিষ্ট্য	ডাঁটাশাক ইত্যাদির মূল	ঘাস বা ধানের মূল
মূলগুলো এক জায়গা থেকে গোছায় বেরিয়েছে, না কি মূলের পাশ থেকে অনেক মূল বেরিয়েছে মাটির ওপরে ছড়িয়ে থাকে, না মাটির ভেতরে ঢুকে যায়		

টুকরো কথা

ডাঁটাশাকের একটাই প্রধান মূল। সেখান থেকে অন্যান্য শাখামূল বেরোয়। এই মূলকে স্থানিক মূল বলে। আর যাদের কোনো প্রধান মূল নেই, তাদের কাণ্ডের গোড়া থেকে অনেকগুলো মূল একসঙ্গে গোছা করে বের হয়। কখনো-কখনো পাতা বা কাণ্ড থেকেও মূল বের হয়। এদের অস্থানিক মূল বলে। ধান, পাথরকুচি বা ঘাসে এই ধরনের মূল দেখা যায়।

তোমার চেনা কয়েকটি গাছের নাম, আর তার মূলটি কোন ধরনের, তা নীচের তালিকায় লেখো:

ক্রমিক সংখ্যা	গাছের নাম	মূলটি কোন ধরনের
	নয়নতারা	
	সন্ধ্যামালতী	
	ধান	
	আম	
	দূর্বাঘাস	
	কচুরিপানা	

নীচের ছবিগুলোতে বিভিন্নরকম মূলের চেহারা দেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

1

2

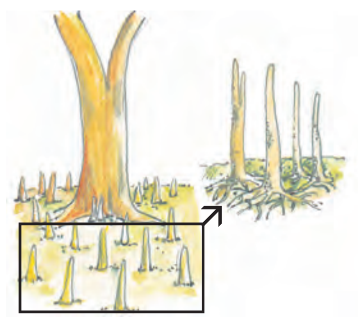
3

4

5

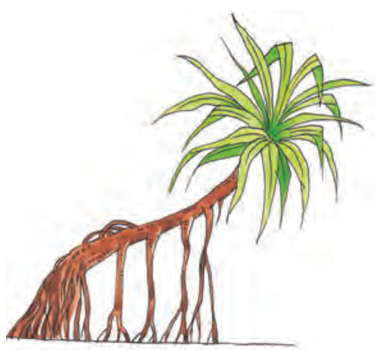
6

7